সৈনিক বেশে দস্যু বনহুর—৩

নিস্তব্ধ রাত্রির সূচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে শোনা যাচ্ছে অশ্ব-পদধ্বনি খট্ খট্ খট্....তাজের পিঠে এগিয়ে আসছে দস্যু বনহুর। সর্বাঙ্গে কালো পোশাক, মাথায় কালো পাগড়ি, কোমরের বেল্টে গুলীভরা রিভলবার।

চৌধুরী বাড়ির অদূরে এসে বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো। তাজের পিঠে মৃদু আঘাত করে বললো–ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে থাকবি, বুঝলি?

তাজ হয়তো বনহুরের কথা বুঝতে পারলো, মৃদু শব্দ করে উঠলো সে–চিঁ হিঁ।

বনহুর অন্ধকারে সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে। বার বার তাকাচ্ছে সে চৌধুরী বাড়ির দোতলার একটি সুউচ্চ কক্ষের দিকে। মুক্ত জানালা দিয়ে কিছুটা বৈদ্যুতিক আলো বেরিয়ে এসে পড়েছে নিচের বাগানের মধ্যে। এই কক্ষটি মনিরার। যতই নিকটবর্তী হচ্ছে সে ততই মনের মধ্যে এক আনন্দের দ্যুতি খেলে যাচ্ছে–মনিরা হয়তো তার জন্য পথ চেয়ে বসে আছে।

এদিকে পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদ গুলীভরা উদ্যত রিভলবার হস্তে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছেন দস্যু বনহুরের।

অদূরে একটি পাইন গাছের আড়ালে লুকিয়ে রিভলবার উদ্যত করে আছেন মিঃ হারুন। অন্যান্য পুলিশ কেউ বা বন্দুক, কেউ বা রাইফেল বাকিয়ে ঝোপের মধ্যে উবু হয়ে প্রতীক্ষা করছে। আজ দস্যু বনহুরকে জীবিত কিংবা মৃত পাকড়াও করা চাই-ই চাই।

বনহুর একেবারে নিকটে পৌঁছে যায়। হঠাৎ তার পায়ে একটি লতা জড়িয়ে পড়ে। পড়তে পড়তে বেঁচে যায় বনহুর। কিন্তু সে সোজা হয়ে দাঁড়াবার পূর্বেই একটি গুলী সাঁ করে চলে যায় তার পাশ কেটে। মুহূর্তে বনহুর বুঝতে পারে–বিপদ তার সম্মুখীন। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে উবু হয়ে শুয়ে পড়ে সে। পর মুহূর্তেই তার মাথার উপর দিয়ে সাঁ সাঁ করে আরও কয়েকটা গুলী চলে গেল। নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে জেগে উঠলো রিভলবার আর রাইফেলের গুলীর আওয়াজ গুড় ম-গুড় ম-গুড় ম....

বনহুর হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলো। এখানে থাকা আর এক দণ্ড তার পক্ষে উচিত নয়। কখনও বুক দিয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলো সে। তখনও তার মাথার উপর দিয়ে গুলী ছুটে চলেছে।

নিজের কক্ষে চমকে উঠলো মনিরা। হাত থেকে খসে পড়লো ফুলের মালা। নিশ্চয়ই মনিরের আগমন পুলিশ বাহিনী জানতে পেরেছে। তারা ভীষণভাবে আক্রমণ করেছে তাকে। মনিরার হৃদপিণ্ড ধক ধক করে কাঁপতে শুরু করলো। হায়। একি হলো! এতোক্ষণ হয়তো মনিরের দেহটা ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে সেখানের মাটি.....আর ভাবতে পারে না মনিরা। একবার ছুটে যায় জানালার পাশে, একবার এসে দাঁড়ায় মেঝের মাঝখানে। ভেবে পায় না কি করবে সে।

গুলীর শব্দে চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগমের নিদ্রা ছুটে যায়। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চৌধুরী সাহেব রেলিং-এর পাশে এসে দাঁড়ান। মরিয়ম বেগম ছুটেন মনিরার কক্ষের দিকে।

মনিরা তখন দরজা খুলে মামুজানের কক্ষের দিকে ছুটতে শুরু করেছে। মরিয়ম বেগমকে দেখতে পেয়ে মনিরা তাঁকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠে—মামীমা, মামীমা, একি হলো, একি হলো!

মরিয়ম বেগম সান্ত্বনার স্বরে বলেন—ভয় নেই মা, গুলী এখানে আসবে না।

তারপর মনিরাকে সঙ্গে করে চৌধুরী সাহেবের কক্ষে গিয়ে দাঁড়ান মরিয়ম বেগম, স্বামীকে লক্ষ্য করে বলেন—ওগো, কি হয়েছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।

বিস্ময়াহত চৌধুরী সাহেবও অস্ফুট কণ্ঠে বলেন—আমিও তো কিছু বুঝতে পারছিনে।

মনিরার চোখে মুখে এক উৎকণ্ঠার ছাপ ফুটে উঠেছে। কি করবে, না বললেও নয়। নিশ্চয়ই পুলিশ বাহিনী তার মনিরের উপর হামলা চালিয়েছে। চঞ্চল কণ্ঠে বলে উঠে মনিরা—মামুজান, নিশ্চয়ই এ পুলিশের রাইফেলের শব্দ। পুলিশ আমাদের বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে।

চৌধুরী সাহেব অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করেন—পুলিশ!

হ্যাঁ হ্যাঁ, মামুজান যাও, ওদের ক্ষান্ত করো। ওদের ক্ষান্ত করো তুমি...

সেকি মা, পুলিশ কেন এভাবে আমাদের বাড়ি ঘেরাও করে গুলী ছুঁড়বে?

মামুজান যাও, বারণ করো; বারণ করো তুমি....নইলে...নইলে সর্বনাশ হবে, সর্বনাশ হবে মামুজান....

মরিয়ম বেগম বাড়ির অদূরে যেখানে গুলীর শব্দ হচ্ছিলো সেদিকে তাকিয়ে বলেন—মনিরা, আমাদের ব্যস্ত হবার কিছু নেই। গুলী আমাদের বাড়ির দিকে ছুঁড়ছে বলে মনে হচ্ছে না; দেখছিস না গুলীর শব্দ ক্রমান্বয়ে ঐদিকে সরে যাচ্ছে।

মনিরা স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো অন্ধকারময় অদূরস্থ পাইন গাছগুলির দিকে। মনের মধ্যে ঝড় বইতে শুরু করেছে। কায়মনে খোদাকে স্মরণ করতে লাগলো, হে দয়াময়! ওকে তুমি রক্ষা করো, ওকে তুমি বাঁচিয়ে নাও প্রভু!

মাত্র কয়েক মিনিট, হঠাৎ মনিরার কানে এসে পৌঁছলো অশ্ব-পদশব্দ খট্ খট্ খট....তবে কি মনির এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে! এ যে তারই অশ্বের পদশব্দ। মুহূর্তে মনিরার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হয়ে উঠে। নিজ মনেই অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে—বেঁচে গেছে, নিশ্চয়ই সে বেঁচে গেছে....

মরিয়ম বেগম আশ্চর্য কণ্ঠে বলে উঠে—সেকি মনিরা, কে বেঁচে গেছে রে?

ঐ যে ও—ও বেঁচে গেছে; শুনছো না মামীমা ওর ঘোড়ার খুরের শব্দ?

তাইতো শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু ওটা কার ঘোড়ার খুরের শব্দ মনিরা? মরিয়ম বেগম কান পেতে শুনতে লাগলেন।

চৌধুরী সাহেব বলেন—তাই তো, একটা ঘোড়া দ্রুত ঐদিকে চলে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ মামাজান, সে বেঁচে গেছে।

কে, কার কথা বলছো, মা মনিরা? চৌধুরী সাহেব প্রশ্ন করেন।

না না কেউ না, কেউ না মামুজান, কেউ না....মনিরা ছুটে চলে যায় নিজের ঘরের দিকে।

কক্ষে প্রবেশ করে খোদার কাছে দু'হাত তুলে শুকরিয়া আদায় করে—হে খোদা, তুমি পরওয়ার দেগার, আমার মনিরকে তুমি নিশ্চয়ই বাঁচিয়ে নিয়েছো। তোমার কাছে হাজার হাজার শুকরিয়া। মালাখানা হাতে তুলে নিয়ে বনহুরের ছবির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর পরিয়ে দেয়

মিঃ আহম্মদের রিভলবারের গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, তিনি দেখতে পেলেন, অন্ধকারে কেউ যেন ভূতলে পড়ে গেল। পুলিশ বাহিনী মুহূর্তমধ্যে ঘিরে ফেললো জায়গাটা, কিন্তু কোথায় কে! মিঃ আহম্মদ স্বয়ং ছুটে গেলেন যেখানে অন্ধকারে কাউকে পড়ে যেতে দেখেছিলেন। টর্চের আলো বিক্ষিপ্তভাবে ছুটাছুটি করতে লাগলো। মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন টর্চের আলো ফেলে ঝোপ ঝাড়, বাগানের আশেপাশে দেখতে লাগলেন। সবাই সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে খুঁজে চলেছে দস্যু বনহুরকে।

মিঃ আহম্মদ বলেন–ইন্সপেক্টর, আমার গুলী দস্যুটাকে ঘায়েল করেছে। নিশ্চয়ই সে মারা পড়েছে কিংবা মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে।

পুলিশ বাহিনী তখনও অনুসন্ধান করে চলেছে। তাদের টর্চের আলো বিক্ষিপ্তভাবে ছুটোছুটি করছে। হঠাৎ একজন পুলিশ তীব্র চিৎকার করে উঠে–হুজুর রক্ত, হুজুর রক্ত...

সবাই দ্রুত এগিয়ে গেলেন সেখানে। একটা পাইন ঝাড়ের পাশে খানিকটা জায়গা রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে। মিঃ হোসেন আনন্দধ্বনি করে উঠেন–স্যার, দস্যু নিহত হয়েছে, দস্যু নিহত হয়েছে।

মিঃ হারুন জায়গাটা ভালোভাবে লক্ষ্য করে বলেন–না, সে নিহত হয়নি, সে আহত হয়েছে। স্যার, আপনার গুলি যে দস্যুটাকে ঘায়েল করেছে, এ সুনিশ্চয়।

সে বেঁচে আছে, আমার গুলী খেয়েও সে বেঁচে আছে। নিহত হয়নি! নিশ্চয়ই তাহলে সে আহত অবস্থায় নিকটেই কোথাও লুকিয়ে আছে। এই মুহূর্তে তোমরা সমস্ত ঝোপঝাড়, বাগান তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখ। আহত অবস্থায় সে পালাতে পারেনি।

মিঃ আহম্মদ যখন তার সঙ্গীদের কথাগুলো বলছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর তার বাম হস্ত চেপে ধরে তাজের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। দক্ষিণ হস্তের আংগুলের ফাঁকে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে তাজা রক্ত। মিঃ আহম্মদের গুলীটা বনহুরের বাম হস্তের মাংস ভেদ করে চলে গেছে।

তাজ মনিবের অবস্থা হয়তো অনুভব করলো। নিঃশব্দে তাজ সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বনহুর অন্ধকারে অতিকষ্টে উঠে বসলো তাজের পিঠে। সঙ্গে সঙ্গে উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো তাজ।

আচমকা অশ্ব-পদশব্দে চমকে উঠেন মিঃ আহম্মদ ও তাঁর দলবল। মিঃ হারুন চিৎকার করে উঠেন–স্যার, দস্যু বনহুরের অশ্ব–পদশব্দ। সঙ্গে সঙ্গে তার রিভলবার গর্জন করে উঠে–গুড়ুম-গুড়ুম.....

মিঃ আহম্মদ রাগে-ক্ষোভে অধর দংশন করেন। সমস্ত পুলিশ বাহিনীকে লক্ষ্য করে হুঙ্কার ছাড়েন–গ্রেপ্তার করো, গ্রেপ্তার করো। গুলী চালাও, গুলী চালাও....

একসঙ্গে অসংখ্য রাইফেল গর্জে উঠে।

কিন্তু তাজের খুরের শব্দ তখন অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। মনিবের বিপদ বুঝতে পেরে তাজ উলকাবেগে ছুটতে শুরু করেছে।

পুলিশ বাহিনীর রাইফেলের গুলী আর তাজের নিকটে পৌছতে সক্ষম হলো না।

ধীরে ধীরে তাজের পদশব্দ অন্ধকারে মিলে গেল।

মিঃ আহম্মদ ক্ষিপ্তের ন্যায় হয়ে উঠলেন। দস্যু বনহুরের কাছে এ যেন তার চরম অপমান। হাঙ্গেরিয়া কারাগার থেকে পালিয়ে রক্ষা পেয়েছে। ভেবেছিলেন এবার তিনি দস্যু বনহুরকে জীবিত কিংবা মৃত পাকড়াও করবেনই। কিন্তু সব বিফলে গেল। এতো প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।

তিনি অফিসে ফিরে এ বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করতে লাগলেন।

মিঃ হারুন পুলিশ সুপারের অবস্থা দর্শনে মনে মনে হাসলেন। প্রকাশ্যে বললেন–স্যার, আপনি এতো উত্তেজিত হচ্ছেন কেন, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে না পারলেও তাকে আপনি ঘায়েল করেছেন। যে দস্যুকে হাঙ্গেরিয়া কারাগার আটকে রাখতে পারেনি বা সক্ষম হয়নি, সেই দস্যু আজ আপনার হস্তে আহত–এটাও কম নয়।

মিঃ হারুনের কথায় সুপার কতকটা যেন আশ্বস্ত হন। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলেন–ইন্সপেক্টার, এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি, আমার রিভলবারের গুলী দস্যুটাকে মারাত্মকভাবে আহত করেছে।

দ্বিতীয় ইন্সপেক্টর মিঃ হোসেন বলেন–স্যার, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, তার জখমটা সাংঘাতিক হয়েছে। নইলে অতো রক্তপাত হতো না।

মিঃ আহম্মদ যেন খুশি হলেন। দস্যুকে যদিও তিনি গ্রেপ্তার করতে পারেননি, তবু কিছুটা সান্ত্বনা পেলেন দস্যু ঘায়েল হয়েছে বলে।

তিনি আরও কিছুক্ষণ এ বিষয় নিয়ে তাঁর দলবলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। তারপর বিদায় গ্রহণ করলেন।

কিন্তু বাসায় ফিরেও মিঃ আহম্মদ স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। অহরহ একটা চিন্তা তাঁকে অক্টোপাশের মত ঘিরে রেখেছিল। তিনি ভেবেছিলেন দস্যু বনহুর সবাইকে হার মানাতে পারে, হাঙ্গেরিয়া কারাগার থেকে পালাতে পারে, কিন্তু তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে না। বাকি রাতটুকু তাঁর ছটফট করে কাটলো। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসে ফোন করলেন। মিঃ হারুন এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার কেবলমাত্র বিশ্রামের জন্য বাড়ি যাবেন ভাবছেন, এমন সময় মিঃ হারুন এবং হোসেনের ডাক এলো। মিঃ আহম্মদ এক্ষুণি তাঁদের আহ্বান জানিয়েছেন।

মিঃ হারুন এবং হোসেন অগত্যা বিশ্রামের আশা ত্যাগ করে মিঃ আহম্মদের বাসভবনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। মিঃ হারুন ও মিঃ হোসেন সুপারের বাসভবনে পৌঁছে আশ্চর্য হলেন। মিঃ আহম্মদের শরীরে তখনও গত সন্ধ্যার ড্রেস দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন। ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারি করছেন মিঃ আহম্মদ।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন সেলুট করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। মিঃ আহম্মদ গম্ভীর কণ্ঠে বলেন–ইন্সপেক্টর, এক্ষুণি মিঃ চৌধুরীর বাড়ির সম্মুখে যে স্থানে দস্যুটার রক্ত দেখা গিয়েছিল ঐখানে যেতে চাই। নিশ্চয়ই কোন ক্লু পাওয়া যেতে পারে। আপনারা প্রস্তুত আছেন?

ইয়েস স্যার, আমরা প্রস্তুত।

তবে চলুন আর বিলম্ব নয়, আমি নিজে ঐ জায়গাটা দিনের আলোয় দেখতে চাই। কথাটা বলে টেবিল থেকে হ্যাটটা তুলে মাথায় পরে নেন মিঃ আহম্মদ।

❑

বনহুরের রক্তে তাজের দেহটা ভিজে চুপসে উঠেছে। এক হস্তে তাজের লাগাম চেপে ধরে উবু হয়ে আছে বনহুর। তাজ প্রাণপণে ছুটে চলেছে।

প্রান্তরের বুক চিরে, গহন বনের ভিতর দিয়ে ছুটছে তাজ। নিস্তব্ধ ধরণীর বুকে তাজের খুরের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলছে খট্ খট্ খট্.....

বনহুরকে নিয়ে তাজ আস্তানায় পৌঁছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ অনুচর মশাল হাতে এগি

এল তাজের পাশে। তাজের পিঠে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স্তব্ধ হয়ে গেল। একজন তীব্র চিৎকার করে উঠলো।

নূরীও এতোক্ষণ বনহুরের প্রতীক্ষায় ছিল, তাজের খুরের শব্দে বেরিয়ে এলো সে। ছুটে গেলো তাজের পাশে, কিন্তু নিকটে পৌঁছেই আর্তনাদ করে উঠলো-উঃ! এ তোমার কি হয়েছে, হুর?

ততক্ষণে বনহুর অনুচরদ্বয়ের সাহায্যে নিচে নেমে দাঁড়িয়েছে। নূরী তাড়াতাড়ি বনহুরের হাতের নিচে নিজের কাঁধটা এগিয়ে দিয়ে ধরে ফেলে-হুর, একি হলো?

মৃদু হেসে বলে বনহুর-সামান্য ঘায়েল হয়েছে মাত্র- সেরে যাবে।

সামান্য! রক্তে চুপসে গেছে তাজের দেহ, আর তুমি বলছো সামান্য ঘায়েল হয়েছে মাত্র?

নূরীর সাহায্যে বনহুর নিজের বিশ্রামকক্ষে পৌঁছল।

বনহুরকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পাশে বসলো নূরী। নিজের ওড়না দিয়ে বেশ করে ওর হাতখানা বেঁধে দিল। নূরী যখন বনহুরের হাতে পট্টি বাঁধছিল তখন তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। বনহুরের কষ্টটা যেন নূরীর হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দিচ্ছিলো। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে-হুর, এবার বল কে তোমার এ অবস্থা করেছে?

শুনে কি হবে নূরী?

রহমানের সাহায্যে এবং তোমার সমস্ত অনুচর নিয়ে আমি তাকে উচিত শাস্তি দেব। আমি তার সর্বনাশ করবো। তোমাকে ঘায়েল করেছে যে, আমি তাকে হত্যা করবো।

সাবাস নূরী!

বলো, বলো! হুর, কে তোমার এ অবস্থা করেছে, বলো?

নূরী, তোমার দীপ্ত কণ্ঠ আমার ক্ষত অনেকটা আরোগ্য করে দিয়েছে। সত্য তুমি বীরাঙ্গনা। কিন্তু এ গুলী আমাকে কে করেছে ঠিক আমিই জানিনে। নইলে দস্যু বনহুর তাকে ক্ষমা করতো না। এখনও আমার দক্ষিণ হস্ত সম্পূর্ণ সুস্থ।

তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?

মোটেই না নূরী, সামান্য কেটেছে মাত্র।

এ আঘাত তুমি সামান্য বলতে পার না বনহুর। এখনও যেভাবে রক্তপাত হচ্ছে, তাতে বিপদ ঘটতে পারে।

নূরী, জানি আমার শরীর থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, কিন্তু এতেও আমি দুর্বল হব না।

বল কি হুর, ডাক্তার নিয়ে আসি। খোদা না করুন তোমার কিছু হয়ে যায়।

ডাক্তার! কথাটা উচ্চারণ করে হাসে বনহুর।

হ্যাঁ ডাক্তার। ডাক্তার না ডাকলে তোমার রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না। দেখছো না ওড়নাখানা সম্পূর্ণ রাঙা হয়ে উঠেছে। আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করা ঠিক নয় হুর।

বনহুর পিছু ডাকে-কোথায় যাচ্ছো নূরী, শোন।

নূরী ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে।

নূরী রহমানের নিকট গিয়ে বললো-রহমান, বনহুরের শরীর থেকে প্রচুর রক্তপাত ঘটেছে। এখনও রক্ত পড়ছে। শিগ্‌গীর কোন ডাক্তারের ব্যবস্থা কর।

ডাক্তার! সর্দার কি এখনই ডাক্তার ডাকতে বললো নূরী?

না, সে বলেনি, কিন্তু ডাক্তার ডাকা ছাড়া কোন উপায় নেই। যাও রহমান, আর বিলম্ব ন...
...না, হুরকে বাঁচাতেই হবে।

কিন্তু

আর কিছু নয়। তুমি দুটো অশ্ব নিয়ে এসো, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। ডাক্তারকে কিন্তু...
আনতে হবে আমিই আনব।

বেশ। রহমান হাতে তালি দেয়–সঙ্গে সঙ্গে দুজন দস্যু এসে দাঁড়ায় সেখানে। রহমান
বলে–দুটো অশ্ব তৈরি করে নিয়ে এসো।

দস্যু দুটি চলে যায়।

নূরী বলে–আমিও তৈরি হয়ে আসছি।

নূরী নিজের কক্ষে প্রবেশ করে, পুরুষের ড্রেসে সজ্জিত হয়। মাথায় পাগড়ি, নাকের নিচে ঘ...
এক ফালি গোঁফ। প্যান্ট এবং আঁটসাঁট একটি কোট। প্যান্টের পকেটে একটি কালো রুমাল ও
একটি রিভলবার লুকিয়ে নেয় সে। তারপর আয়নার সম্মুখে দাঁড়ায়, ঠিক তখন তাকে একটি অল্প
বছরের যুবকের মত লাগছিল।

এবার নূরী বনহুরের কক্ষে প্রবেশ করলো।

বনহুর তখন বিছানায় চীৎ হয়ে শুয়ে কিছু ভাবছিল। পদশব্দে চোখ মেলে তাকায়। হঠা...
কক্ষে অপরিচিত এক যুবককে দেখে প্রথমে আশ্চর্য হয়, পর মুহূর্তেই মৃদু হাসে।

নূরী গম্ভীরভাবে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় বনহুরের সম্মুখে। কোন কথা বলে না সে।

বনহুর কিন্তু নূরীকে চিনে ফেলেছে, তবু মনোভাব গোপন করে বলে–যুবক, তোমার নাম...

নূরী তবু নিশ্চুপ।

বনহুর দক্ষিণ হস্তে নূরীর হাত ধরে টেনে নেয় কাছে।

নূরীর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব শিহরণ বয়ে যায়। আজ পর্যন্ত বনহুর নূরীকে কোনদিন এভাবে
আকর্ষণ করেনি। আনন্দ আপ্লুত নূরীর দু'চোখ ছাপিয়ে পানি আসে।

বনহুর স্নেহ-বিজড়িত কণ্ঠে বলে–এ ড্রেসে কোথায় যাচ্ছো নূরী?

ডাক্তার ডাকতে।

কিন্তু ডাক্তার এখানে এসে ফিরে যেতে পারবে?

ভয় নেই, তোমার আস্তানার সন্ধান সে জানতে পারবে না। ছেড়ে দাও হুর, দেরী হয়ে গেল

বনহুর ওকে ছেড়ে দেয়। দ্রুত বেরিয়ে যায় নূরী। বাইরে গিয়ে দেখতে পায় রহমান দুটো
অশ্ব নিয়ে অপেক্ষা করছে।

নূরী রহমানকে লক্ষ্য করে বলে–রহমান, খুব দ্রুত কাজ করতে হবে। রাত ভোর হবার
পূর্বেই ডাক্তার যেন তার নিজ বাড়ি ফিরে যেতে পারে।

আচ্ছা, তাই হবে।

দুটি অশ্বে দুজন চড়ে বসে। অন্ধকারে অশ্ব দুটি ছুটতে শুরু করে।

পথিমধ্যে রহমান ভেবে নেয় কোন ডাক্তারকে হলে তাদের ভালো হয়। তাই বিলম্ব হয় না
শহরের বিশিষ্ট ডাক্তার জয়ন্ত সেনের নিকটে যাওয়াই ঠিক করলো।

বনের শেষ প্রান্তে তাদের মোটর গাড়ি প্রতীক্ষা করছিল। ঘোড়া দু'টি গোপন স্থানে বেঁধে

রেখে গাড়িতে উঠে বসে ওরা দু'জন।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের গাড়ি ডাক্তার সেনের গাড়ি বারান্দায় গিয়ে পৌঁছল। রহমানই ড্রাইভ করছিল, রহমানের শরীরেও ছিল ড্রাইভারের ড্রেস। রহমান গাড়ি থেকে নেমে দরজার পাশে গিয়ে কলিং বেলে হাত রাখলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে সম্মুখে এসে দাঁড়াল একটি লোক। হয়তো বাড়ির চাকর-বাকর হবে। লোকটা জিজ্ঞাসা করলো—আপনারা কাকে চান'?

নূরী ব্যস্তকণ্ঠে বললো—ডাক্তার বাবুকে ডেকে দাও। একটু তাড়াতাড়ি, বুঝলে'?

কিন্তু তিনি তো রাতে কোন রোগী দেখেন না। লোকটি বললো।

ডাক্তার বাবুকে ডেকে দাও, তিনি যা করেন—করবেন।

কি বলবো? আপনারা কোথা থেকে এসেছেন'?

কিছু বলতে হবে না; শুধু বলবে, একটি যুবক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

এবার লোকটা একবার যুবকের মুখে আর একবার তার গাড়িখানার দিকে তাকিয়ে চলে যায়।

অল্পক্ষণেই পুনরায় লোকটি ফিরে এসে বলে—আসুন, ভিতরে এসে বসুন।

নূরী লোকটার পিছু পিছু হলঘরে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর করুণ কণ্ঠে বলে—দেখ, একটু তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডেকে দাও।

এই যে এলেন বলে—আপনি বসুন। তারপর নিজ মনেই বলে চলে লোকটা—এই রাত দুপুরে রোগী। বাপরে বাপ, রাতেও একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেবে না বাবা।

ততক্ষণে কক্ষে প্রবেশ করেন ডাক্তার সেন। মধ্যবয়স্ক গম্ভীর প্রকৃতির লোকটি। স্লিপিং গাউনের বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে এসেছেন তিনি। নূরীকে দেখে বলেন—যুবক, তুমি কি জানো না আমি রাতে রোগী দেখি না?

জানি, কিন্তু এক্সিডেন্ট হয়েছে....

এক্সিডেন্ট! যুবক, তুমি তো দিব্যি দাঁড়িয়ে আছ— তোমার কি হয়েছে?

ডাক্তারবাবু, আমার নয়—আমার বড় ভাই এক্সিডেন্ট হয়েছে। না গেলেই নয়, দয়া করে একটিবার চলুন—চলুন ডাক্তার বাবু...নূরীর গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

কি বললে, তোমার এক্সিডেন্ট নয়? তোমার ভাই-এর—আমি যাব এই রাতদুপুরে বাইরে রোগী দেখতে!

নূরী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে ডাক্তার বাবু, না গেলেই নয়। নইলে ওকে বাঁচানো যাবে না। ডাক্তার বাবু চলুন, দয়া করে চলুন। ডাক্তার বাবু...

অসম্ভব। রাতে আমি কোথাও যাই না।

আপনার পায়ে পড়ি ডাক্তার বাবু, চলুন...নূরী কাঁদতে থাকে। ডাক্তারের মনে হয়তো মায়ার উদ্রেক হয়। দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলেন—এখন রাত চারটে; আর ঘণ্টা দুই কিংবা তিন পরে গেলে চলবে না?

না, ডাক্তার বাবু না, আপনি দয়া করে এক্ষুণি চলুন। আপনার পায়ে পড়ি ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার সেন দেখলেন না গেলেই নয়, যুবকটি নাছোড়বান্দা হয়ে ধরেছে। এবার বলেন তিনি—রাতে কোথাও রোগী দেখি না বা কলে যাই না। ফি কিন্তু ডবল দিতে হবে।

তাই দেব, তাই দেব ডাক্তার বাবু, কত চান আপনি'?

দু'শো টাকা দিতে হবে।

বেশ, তাই পাবেন।

ডাক্তার সেন বলেন, রোগীর শরীর থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে?

হ্যাঁ ডাক্তার বাবু, রোগীর শরীর থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে।

তাহলে তো রক্তের প্রয়োজন?

রক্ত—সে চিন্তা করবেন না ডাক্তার বাবু, আমি—আমিই দেব রক্ত।

কিন্তু রোগীকে এখানে আনতে পারলে সব বিষয়ে সুবিধা হতো।

না না, সে রকম কোন উপায়ই নেই। রোগী অত্যন্ত কঠিন। না-না প্রয়োজন নিয়ে চলু

ডাক্তার বাবু, আমার গাড়িতেই আপনাকে পৌঁছে দেব।

বেশ, তাই হবে। কিন্তু অনেক কিছু নিতে হচ্ছে।

তাই নিন, কোন অসুবিধা হবে না।

ডাক্তার সেন তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং ঔষধাদি নিয়ে নূরীর গাড়িতে চেপে বসলেন।

ডাক্তার সেনকে নিয়ে নূরীর গাড়ি ডবল স্পীডে ছুটে চলেছে। রহমান গাড়ি চালাচ্ছে।

ডাক্তার সেন বললেন—কত দূর হবে?

নূরী জবাব দিল—একটু দূরেই হবে ডাক্তার বাবু। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোন ভয় নেই।

ডাক্তার সেন একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে ভালোভাবে ঠেস দিয়ে বসেন।

গাড়ি তখন আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছুটে চলেছে।

নূরী ধীরে ধীরে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে রিভলবার খানা বের করে নেয়। তারপর হঠাৎ অতর্কিতভাবে চেপে ধরলো ডাক্তার সেনের পাঁজরে—ডাক্তার বাবু, ভয় নেই, কিন্তু এবার আপনার চোখে রুমাল বাঁধতে হবে।

ডাক্তার সেনের হাত থেকে অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা খসে পড়লো। দু'হাত তুলে ধরলো উপরের দিকে। ভয়াতুর চোখে তাকালেন নূরীর মুখের দিকে, ঢোক গিলে বলেন—যুবক, তোমার মতলব

নূরী স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললো...আমি আপনার কোন ক্ষতি করবো না। শুধু চোখে রুমাল বাঁধতে হবে।

তার মানে?

মানে, আমি আপনাকে যেখানে নিয়ে যাব সে স্থানটি অতি গোপনীয়। কাজেই আপনাকে চোখে রুমাল বাঁধতে হবে। এতে আপত্তি করলে বিপদে পড়বেন। এতে আপনার কোন অমঙ্গল হবে না।

ডাক্তার সেনের ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠে। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেন তিনি—বেশ, তাই হবে।

নূরী একটি কালো পুরু রুমাল বের করে ডাক্তার সেনের চোখে মজবুত করে বাঁধলো। তারপর বললো—আপনি চুপ করে থাকুন, যা করতে হয় আমরাই করবো। তারপর রোগীর নিকটে পৌঁছে আপনার কাজ।

বনের পাশে এসে গাড়ি থামলো। রহমান গুপ্তস্থান হতে অশ্ব দুটি নিয়ে এলো। তারপর একটিতে ডাক্তার এবং ঔষধের বাক্স ও রহমান চেপে বসলো। অন্যটিতে নূরী।

ডাক্তারকে নিয়ে একেবারে বনহুরের কক্ষে প্রবেশ করলো নূরী। তারপর ওর চোখের রুমাল খুলে দিয়ে বললো—ডাক্তার বাবু, এই যে রোগী।

প্রায় অর্ধঘণ্টা কালো কাপড়ে চোখ বাঁধা থাকায় কেমন যেন ধাঁ ধাঁ মেরে গিয়েছিলেন ডাক্তার সেন। প্রথমে চোখ দুটো একটু রগড়ে নিলেন, তারপর তাকালেন সম্মুখে। দেখতে পেলেন সম্মুখে শয্যায় শায়িত এক যুবক। বনহুরের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর তাকালেন কক্ষের চারিদিকে। এ কোথায় এসেছেন কিছুই বুঝতে পারলেন না।

নূরী বলে উঠে–ডাক্তার বাবু, এবার দয়া করে ওকে দেখুন।

বনহুর একবার নূরী আর একবার রহমানের মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তারকে লক্ষ্য করে বললো–বসুন।

ডাক্তার সেন এবার বনহুরের বিছানার পাশে বসলেন। বনহুরকে পরীক্ষা করে বলেন–এটা গুলীর আঘাত বলে মনে হচ্ছে?

বনহুর জবাব দিল–হ্যাঁ, রিভলবারের গুলী লেগেছিল। তবে গুলীটা ভেতরে নেই, বেরিয়ে গেছে।

হ্যাঁ, সেরকমই দেখছি; কিন্তু যেভাবে ক্ষত হয়েছে, প্রচুর রক্তের প্রয়োজন।

রক্ত?

হাঁ, প্রচুর রক্ত লাগবে।

কিন্তু রক্ত কোথায় পাওয়া যাবে? একটু চিন্তিত কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে বনহুর।

নূরী বলে উঠে–কেন, আমার শরীরে এখনও প্রচুর রক্ত জমা আছে। ডাক্তার বাবু, আপনি আমার রক্ত তুলে নিয়ে ওকে বাঁচান।

তা হয় না। ডাক্তার বাবু, আপনি রক্ত ছাড়া যতটুকু পারেন করুন। রক্ত আমার লাগবে না। গম্ভীর কণ্ঠে বলে বনহুর।

ডাক্তার সেন বলে উঠেন–তা হয় না, রক্ত লাগবেই।

নূরী পুনরায় বলে–আমার রক্ত না নিলে আমি এক্ষুণি নিজকে বিসর্জন দেব।

ডাক্তার সেন বলেন–বেশ, তাই হোক। এই যুবকের রক্তেই আমি আপনাকে...।

এবার শুরু হলো চিকিৎসা।

নূরীকে পাশের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ওর শরীর থেকে রক্ত নিয়ে বনহুরের শরীরে দেওয়া হলো।

ডাক্তার সেন মনোযোগ সহকারে কাজ করে চললেন।

হাতখানায় সুন্দর করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। আর রক্তপাত হচ্ছে না।

কিন্তু ডাক্তার সেনের কাজ যখন শেষ হলো তখন রাত আর বেশি নেই। বনহুরের ইংগিতে রহমান একটা থলে এনে ডাক্তার সেনের হাতে দিলেন।

বনহুর বললো–ওটাতে আপনার পারিশ্রমিক আছে; নিয়ে যান।

ডাক্তার সেন থলে হাতে নিয়ে একটু অবাক হলেন। কারণ তাকে দু'শ টাকা বন্দোবস্ত করে নিয়ে আসা হয়েছে। দু'খানা একশত করে টাকার নোট দিলেই চলত। এখানে গুণে দেখাটাও ভদ্রতা হবে না। কাজেই থলেটা পকেটে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

রহমান হঠাৎ তাঁর চোখের সম্মুখে কালো রুমালখানা ধরে বললো–আসুন এটা বেঁধে দি।

ডাক্তার সেন দেখলেন, না বেঁধে যখন কোন উপায় নেই তখন নীরবই রইলেন।

রহমান ডাক্তারের চোখ বেঁধে হাত ধরলো–আসুন, আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি।

ডাক্তার সেন চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে বলেন—আপনার নামটা তো বললেন না?

বনহুর হেসে বললো—ঐ খলের মধ্যেই আমার পরিচয়। তারপর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—ডাক্তার সেনের যেন কোন অসুবিধা না হয় লক্ষ্য রেখ রহমান।

আচ্ছা রাখবো।

রহমানের হাত ধরে চলতে চলতে ডাক্তার সেনের মনে নানা কথার উদ্ভব হচ্ছে। নিশ্চয়ই এটা কোন গোপন স্থান হবে। নইলে তার চোখ এমন করে বাঁধবে কেন। যাক গে যে স্থানই হোক তার এতো মাথা ঘামিয়ে লাভ কি! টাকা দু'শ পেলেই হলো। তাছাড়া রোগীর ব্যবহার চমৎকার কথাবার্তাগুলোও তেমনি মনোমুগ্ধকর। কিন্তু কে এই যুবক—যার চেহারা এতো সুন্দর, যার ব্যবহার এতো মহৎ, যার হৃদয় এতো উন্নত!

ডাক্তার সেনকে নিয়ে রহমান অশ্বযোগে একেবারে ট্যাক্সির নিকটে পৌঁছল, তারপর ট্যাক্সিতে বসিয়ে প্রায় পনেরো মিনিট ডবল স্পীডে চলার পর ডাক্তার সেনের চোখের রুমাল খুলে দিলো রহমান। তখন পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে।

অল্পক্ষণেই গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি পৌঁছে গেল।

ডাক্তার গাড়ি থেকে নেমে চট করে গাড়ির নাম্বার লিখে নিলেন। কিন্তু একি! এযে তারই গাড়ির নাম্বার। গাড়ির দিকে ভালো করে তাকালেন—তাই তো, এ যে তারই গাড়ি! কিন্তু ড্রাইভার কই! ডাক্তার সেন চিৎকার করে দারোয়ানকে ডাকতে লাগলেন—গুরু সিং, গুরু সিং...

ততক্ষণে রহমান গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ইতোমধ্যে দারোয়ান এসে সেলুট ঠুকে দাঁড়ালেন—হুজুর, হামকো বোলাতে; হ্যায়!

বেটা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলি, না? দ্যাখ তো আমার গাড়ি গ্যারেজে আছে?

হুজুর, গাড়ি তো আভি ড্রাইভার আপকো লে আনে গেয়া।

বল কি!

হ্যাঁ হুজুর।

ড্রাইভার! কোথায় ড্রাইভার? রজত, রজত....রজত ড্রাইভারের নাম।

মনিবের ডাকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে আসে রজত—স্যার, আমাকে ডাকছেন?

হ্যাঁ, তোমাকে ডাকবো না তো আর কেউ রজত আছে?

বলুন স্যার?

গাড়ি নিয়ে আমাকে আনতে গিয়েছিলে?

সেকি স্যার, আমি তো নাক ডেকে ঘুমোচ্ছি, আপনাকে কখন আনতে গেলুম!

দারোয়ান গুরু সিং বলে উঠে—হাময়ারা চোখ আন্ধা হুয়া নেহি। তুমি গাড়ি লে-কর গিয়া নেহি?

রজত ক্ষেপে উঠে—নেহি নেহি; আমি ঘুমিয়েছিলুম স্যার, কোথাও যাইনি। সেই সন্ধ্যায় আপনাকে রোগীর গাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি। তারপর রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়েছি। রাতে একটিবার ঘুম পর্যন্ত ভাংগেনি স্যার।

তাহলে তুমি গাড়ি নিয়ে যাওনি?

না স্যার, আমি যাইনি।

যাও দেখো তো আমার গাড়ি গ্যারেজে আছে কিনা?

কেন থাকবে না স্যার, আমি শোবার পূর্বে গাড়ি গ্যারেজে বন্ধ করে তবেই তো শুয়েছি।

বললুম যাও।

রজত বেরিয়ে যায়। একটু পরে ফিরে এসে বলে–স্যার গাড়ি তো গ্যারেজে নেই।

ডাক্তার সেন আপন মনেই বলে উঠেন–একি অদ্ভুত কাণ্ড। সব যে দেখছি ভূতুড়ে ব্যাপার!

রজত আর্তকণ্ঠে বলে উঠে–কি বলেন স্যার, সব ভূতুড়ে ব্যাপার? এ্যাঁ, এসব স্বপ্ন দেখছি না তো?

দারোয়ান গুরু সিং বাংলা ভালো বলতে পারে না সত্য, কিন্তু বাংলা বুঝে সে সব। ভূতের নাম শুনে আঁতকে উঠে। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠে–হুজুর, কাঁহা ভূত?

ডাক্তার সেন রাগতভাবে বলেন–ভূত নেহি, ভূত নেহি, তুম লোগ ভূত..

হাম লোগ ভূত। হাম লোগ তো বহুৎ আচ্ছা আদমী। হুজুর, হাম লোগ ভূত নেহি–আদম।

ডাক্তার সেন কারো কথা কানে না নিয়ে ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ করেন।

তখন পূর্ব আকাশে সূর্যোদয় হয়েছে।

দারোয়ান এবং ড্রাইভার কোন কিছু বুঝতে না পেরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নেয়।

ডাক্তার সেন কক্ষে প্রবেশ করে কোটের পকেট থেকে টাকার থলেটা বের করে খুলে ফেলেন, সত্যই ওতে টাকা আছে, না অন্য কিছু। থলে খুলে বিস্ময়ে হতবাক হন, কোথায় দু'শ টাকা–এক শ' করে প্রায় পঞ্চাশখানা নোট তাড়া করে বাঁধা রয়েছে! ডাক্তার সেনের চোখ দুটো উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠেছে। থলেটা আর একবার হাতড়ে দেখলেন– একি! ছোট্ট এক টুকরা কাগজ ভাঁজ করা রয়েছে। কাগজের টুকরাখানা মেলে ধরেন চোখের সামনে। কাগজে লেখা রয়েছে–

"ডাক্তার সেন, আপনার পারিশ্রমিক
বাবদ পাঁচ হাজার টাকা রইল। গাড়ি
ঠিক সময় ফেরত পাবেন।
–দস্যু বনহুর

ডাক্তার সেন অস্ফুট শব্দ করে উঠেন–দস্যু বনহুর। তাঁর হস্তস্থিত থলেটা খসে পড়ে ভূতলে। তিনি চিৎকার করে ডাকেন–দারোয়ান, দারোয়ান–পুলিশ–পুলিশ....

ছুটে আসে দারোয়ান গুরু সিং, ছুটে আসে ড্রাইভার, আরও অনেকে। সবাই একবাক্যে বলে–কি হলো স্যার? কি হলো?

ডাক্তার সেনের দু'চোখ তখন কপালে উঠেছে। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেন–দস্যু বনহুর–দস্যু বনহুর.....

সবাই পিছু ফিরে ছুটতে শুরু করে, কেউ বা বলে–ওরে বাবা–দস্যু বনহুর!

এক মুহূর্তে গোটা বাড়িতে হুলস্থূল পড়ে যায়। যে যে দিকে পারে ছুটছে আর বলছে–দস্যু বনহুর! দস্যু বনহুর!

কার পায়ে কে পড়ছে ঠিক নেই। উঠছে আর পড়ছে, আর বলছে–দস্যু বনহুর....দস্যু বনহুর....

ডাক্তার সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মিঃ হেমন্ত সেনের ঘুম ভেঙে গেল। সে ধড়ফড় সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলো আর চিৎকার করে বলতে লাগলো–ব্যাপার কি? কি হয়েছে?

এমন সময় ডাক্তার সেনের স্ত্রী ছুটে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন বাবা ঐ [illegible] ল্যাবরেটরীতে দস্যু বনহুর এসেছে, দস্যু বনহুর এসেছে!

বলো কি মা, দস্যু বনহুর!

হ্যাঁ বাবা, এখন উপায়?

মা, তুমি ঘাবড়িও না, আমি এক্ষুণি পুলিশ অফিসে ফোন করছি। হেমন্ত পুনরায় সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়; নিজের কক্ষে ফিরে গিয়ে রিসিভারটা হাতে উঠিয়ে নেয়—হ্যালো, পুলিশ অফিস...

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন তখন পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদের ওখানে ছিলেন।

ডিটেকটিভ মিঃ শঙ্কর রাও তখন কোন কাজে পুলিশ অফিসে এসেছিলেন, তিনিই ফোন ধরলেন—হ্যালো!

ওপাশ থেকে ভেসে এলো মিঃ হেমন্ত সেনের কম্পিত কণ্ঠস্বর—আপনি কি ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন কথা বলছেন?

না, তিনি বাইরে গেছেন, আমি শঙ্কর রাও কথা বলছি।

হেমন্তর গলা—আমাদের ল্যাবরেটরীতে দস্যু বনহুর হানা দিয়েছে।

শঙ্কর রাও আশ্চর্য কণ্ঠে বলে উঠেন—দস্যু বনহুর আপনাদের ল্যাবরেটরীতে.... [illegible] এক্ষুণি মিঃ হারুনকে ফোন করছি।

একটু শীঘ্র করুন....

পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদ এবং মিঃ হারুন ও মিঃ হোসেন চৌধুরী বাড়ি যাবার জন্য কেবলমাত্র দরজার দিকে পা বাড়িয়েছেন অমনি ফোনটা শিহরন বেজে উঠে—ক্রিং....ক্রিং....ক্রিং....

মিঃ আহম্মদ থমকে দাঁড়িয়ে রিসিভারটা হাতে উঠিয়ে নেন। রিসিভারে কান লাগিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করে উঠেন—কি বললে, দস্যু বনহুর! ডাক্তার সেনের বাড়িতে দস্যু বনহুর..... আচ্ছা আমরা এক্ষুণি আসছি। রিসিভার রেখে বলে উঠেন—ইন্সপেক্টার, দেখছেন দস্যু বনহুরের সাহস! সে প্রকাশ্যে দিনের আলোতে ডক্টর সেনের ল্যাবরেটরীতে হানা দিয়েছে।

মিঃ হারুন বললেন—হানা সে দেয়নি। আমি পূর্বেই বলেছিলাম দস্যু বনহুর সাংঘাতিকভাবে ঘায়েল হয়েছে। এবার দেখুন সে চিকিৎসার জন্য লোকালয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে।

মিঃ আহম্মদ হুঙ্কার ছাড়েন—আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়। চৌধুরীর ওখানে আর গিয়ে কাজ নেই। ইন্সপেক্টর, আপনি কিছু সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ-ফোর্স নিয়ে এক্ষুণি ডক্টর সেনের ল্যাবরেটরীতে গিয়ে হাজির হন। আমি মিঃ হোসেনকে নিয়ে অন্য পথে [illegible]। মিঃ আহম্মদ আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে গাড়ি নিয়ে ছুটলেন।

অর্ধঘণ্টার মধ্যেই সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স নিয়ে মিঃ হারুন উপস্থিত হলেন। অন্য পথে এসে হাজির হলেন পুলিশ সুপার স্বয়ং এবং মিঃ হোসেন। মুহূর্তে ডাক্তার সেনের বাড়ি এবং ল্যাবরেটরী পুলিশ বাহিনী ঘেরাও করে ফেলল।

পুলিশ সুপার এবং মিঃ হারুন গুলীভরা রিভলভার হস্তে ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ করলেন। মিঃ আহম্মদ বললেন—কোথায় দস্যু বনহুর?

ডাক্তার সেন তো অবাক! তিনি হতভম্বের মত উঠে দাঁড়ালেন। সমস্ত বাড়ি এবং ল্যাবরেটরীর চারিদিকে পুলিশ বাহিনী দেখে থ' মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মিঃ হারুন গম্ভীর কণ্ঠে গর্জে উঠলেন—দস্যু বনহুর কই?

ডাক্তার সেন উভয়ের উদ্যত রিভলভারের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে বলেন—কে বললো এখানে দস্যু বনহুর আছে?

শঙ্কর রাও-ও এসেছিলেন মিঃ হারুনের সঙ্গে, তিনি বলেন—আপনার পুত্র মিঃ হেমন্ত সেন পুলিশ অফিসে ফোন করেছিলেন।

কিন্তু কিন্তু এখানে তো দস্যু বনহুর আসেনি ইন্সপেক্টার।

মিঃ আহম্মদ বজ্রকঠিন স্বরে বলেন—সেকি!

স্যার, আপনারা বসুন, আমি সব বলছি।

আমরা বসতে আসিনি ডাক্তার সেন, বলুন কোথায় দস্যু বনহুর? রাগত কণ্ঠে কথাটা বলেন মিঃ আহম্মদ।

অবশ্য তাঁর রাগ হবার কারণও আছে। তাঁর মত উচ্চপদস্থ অফিসার কোনদিন কোন দস্যুর পিছনে হাওয়া করেছেন কিনা সন্দেহ। শুধু দস্যু বনহুর তাঁকে এভাবে ঘাবড়ে তুলেছে। ঐ শয়তানটাকে ধরার জন্য আজ তিনি নিজে নেমে পড়েছেন।

মিঃ আহম্মদের চোখ দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। ডাক্তার সেন ভড়কে গেলেন, কণ্ঠে মিনতি মেখে বলেন—বসুন, আমি সব খুলে বলছি।

মিঃ হারুন, মিঃ আহম্মদকে লক্ষ্য করে বলেন—স্যার, ব্যাপারটা রহস্যজনক মনে হচ্ছে।

মিঃ আহম্মদ আসন গ্রহণ করলেন। ডাক্তার সেনও আর একটি চেয়ারে বসে রুমালে মুখ মুছতে লাগলেন।

মিঃ হারুন, মিঃ হোসেন এবং অন্যান্য সকলে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ডাক্তার সেন রাতের ঘটনা বিস্তারিত সব বলে গেলেন এবং দস্যু বনহুরের দেওয়া পাঁচ হাজার টাকা এবং সেই ছোট্ট কাগজের টুকরাখানা বের করে দেখালেন।

সব শুনে এবং দেখে বিস্ময়ে থ' বনে গেলেন সবাই। মিঃ আহম্মদ বলেন—ডক্টর সেন, আপনি কোন ক্রমেই সেই পথ চিনে নিতে পারেন নি?

না, একে অন্ধকার রাত, তদুপরি আমার চোখ কালো কাপড়ে মজবুত করে বাঁধা ছিল। সে বাড়ি যে শহরের কোন প্রান্তে বা কোন স্থানে, আমি কিছুই বলতে পারবো না। গাড়ি থেকে নামিয়ে ওরা আমাকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সে এক অদ্ভুত বাড়ি। বিরাট রাজপ্রাসাদের মত বাড়িটা। অমন সুন্দর বাড়ি আমি কোনদিন দেখিনি।

মিঃ আহম্মদ বলেন—ডক্টর সেন, দস্যু বনহুরের চিঠিতে জানতে পেরেছি, সে আপনার গাড়ি ফেরত দিতে আসবে।

শঙ্কর রাও বলে উঠেন—স্যার, সে তো নিজে আসবে না।

হ্যাঁ, সে নিজে আসবে না; আর আসবেই বা কেমন করে; সে তো আহত। নিশ্চয়ই তার কোন অনুচর আসবে

অল্পক্ষণেই কক্ষে প্রবেশ করেন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর মিঃ মাকসুদ। লম্বা সেলুট দিয়ে বললেন—স্যার, আপনি আমাকে ডেকেছেন?

মিঃ হারুন বললেন—না তো, আপনাকে ডাকা হয়নি!

তবে যে ডাক্তার সেনের ড্রাইভার তার গাড়ি নিয়ে আমাকে আনতে গিয়েছিল?

ডাক্তার সেন বিস্ময়ভরা চোখে নিজের পাশে তাকিয়ে বললেন—এই তো আমার ড্রাইভার রঞ্জন।

মিঃ আহমদ উঠে দাঁড়ান—দেখুন ইন্সপেক্টর, শীঘ্র গাড়ির ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করে ফেলুন, নিশ্চয়ই ড্রাইভারের ছদ্মবেশে দস্যু বনহুরের অনুচর।

সবাই ছুটলেন গাড়ির পাশে।

কিন্তু গাড়ির নিকটে পৌঁছে সবাই হতবাক, গাড়িতে কোন ড্রাইভার বা কোন লোক নেই।

কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ বাইরে তখনও গুলীভরা রাইফেল হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। মিঃ হারুন তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—এ গাড়ির ড্রাইভার কোথায় গেল দেখেছো তোমরা?

ওদের একজন বললো—হাঁ হুজুর আভি থা, লেকেন ওধার গেয়া...পেশাব-ওশাব করনে কে লিয়ে....

কিন্তু কোথায় কে—সব জায়গা তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো—কোথায় দস্যু বনহুরের অনুচর!

ডাক্তার সেন সকলের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন।

মিঃ হারুন জিজ্ঞাসা করলেন—এটাই আপনার গাড়ি?

ডাক্তার সেন স্থির স্বাভাবিক গলায় বললেন— হাঁ, এটাই আমার গাড়ি।

সকলের মুখেই হতাশার ছায়া ফুটে উঠে।

দস্যু বনহুরের নিকটে এ একটি দারুণ পরাজয়।

মিঃ আহমদ নিজের গাড়িতে উঠে বসলেন।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন তাঁদের নিজ নিজ গাড়িতে ফিরে চললেন। সকলের মুখই গম্ভীর থমথমে, আষাঢ়ে মেঘের মতই অন্ধকার।

এতোক্ষণে ডাক্তার সেনের মুখে হাসি ফুটলো। এক রাতেই পাঁচ হাজার টাকা আর গাড়িখানাও ফেরত পেলেন—এ কম কথা নয়!

❑

অবসন্ন দেহে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলো নূরী, খেয়াল নেই। চোখ মেলে তাকিয়ে আশ্চর্য হলো—বনহুরের বিছানা শূন্য; বিছানায় বনহুর নেই। নূরী চিন্তিত হলো, অসুস্থ অবস্থায় কোথায় গেল সে।

নূরী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। মন্থর গতিতে বেরিয়ে এলো বাইরে। মুক্ত আকাশের তলায় এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ দেখতে পেলো বনহুর একটি পাথরখণ্ডে বসে রহমানের সঙ্গে কি সব আলোচনা করছে।

নূরী তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। রহমানের সঙ্গে বনহুরের কথাবার্তা শেষ হয়ে গিয়েছিল, ফিরে তাকালো বনহুর নূরীর মুখের দিকে।

নূরী ব্যথা-কাতর মুখে বললো—হুর, একটি দিনও কি তোমার বিছানায় শুয়ে থাকতে নেই? চলো। বনহুর উঠে দাঁড়ায়।

নূরী বনহুরের হাত ধরে বললো—চলো।

তারপর ওকে সঙ্গে করে ফিরে এলো বনহুরের বিশ্রামাগারে। ওকে যত্ন করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললো নূরী–এবার বলো তো, ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও কেন তুমি শয্যা ত্যাগ করেছিলে?

বনহুর নূরীর কথায় মৃদু হাসলো, তারপর বললো—নূরী তুমি বুঝবে না; আমার শুয়ে থাকলে চলবে কেন। তুমি তো ডাক্তার এনেই ক্ষান্ত-তারপর ওদিকের অবস্থা একবার ভেবে দেখেছ? ডাক্তার তো বাসায় ফিরে একেবারে মহা হুলস্থুল বাঁধিয়ে দিলেন। পুলিশে পুলিশে তাঁর গোটা বাড়ি ছেয়ে গেছে। পুলিশ মনে করেছে-দস্যু বনহুর বুঝি তার বাড়ি গিয়ে বসে আছে।

এতো খবর কি করে পেলে বনহুর?

রহমান ডাক্তারকে রাখতে গিয়ে সেই ভোর থেকে ওখানেই ছিল। এতোক্ষণে ডাক্তারের গাড়ি ফেরত দিয়ে তবে এলো।

বাপরে বাপ। রহমান তোমারই তো সহকারী।

তারপর গোটা দুটো দিন কেটে গেল। নূরী বনহুরকে কিছুতেই বিছানা থেকে উঠতে দিল না। সদা-সর্বদা বনহুরের পাশে বসে ওর সেবা—যত্ন করত নূরী। নিজ হস্তে বনহুরের ক্ষত পরিষ্কার করে দিত। নিজ হস্তে দুধের বাটি তুলে ধরত ওর মুখে। ঔষধ খাওয়াত, মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াত।

একদিন হঠাৎ বনহুরের ঘুম ভেংগে গেল, তাকিয়ে দেখতে পেল—তার শিয়রে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে নূরী। নূরীর একখানা হাত তখনও বনহুরের মাথায় রয়েছে। নূরী বনহুরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে ঠিক নেই।

বনহুর ওর হাতখানা ধীরে ধীরে সরিয়ে রেখে উঠে বসলো। নূরীর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তার ঠোঁটের কাছে একটু খানি হাসির রেখা ফুটে উঠে। করুণায় ভরে উঠলো বনহুরের মন। নূরীর গায়ে হাত রেখে ডাকলো—নূরী।

চমকে সোজা হয়ে বসলো নূরী—ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

নূরী!

বল?

এভাবে তুমি নিজকে কষ্ট দিচ্ছো কেন?

মৃদু হাসি নূরীর—কে বললো আমার কষ্ট হচ্ছে? হুর, তোমার সেবা করাই যে আমার জীবনের ব্রত!

বনহুর প্রদীপের ক্ষীণালোকে নূরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সত্যিই নূরী তাকে কত ভালবাসে, কিন্তু তার এ ভালবাসার প্রতিদানে কি দিয়েছে সে নূরীকে! বনহুরের চোখ দুটো আর্দ্র হয়ে উঠে। দৃষ্টি নত করে নেয় বনহুর।

নূরী স্বাভাবিক গলায় বলে—হুর, কি হলো তোমার?

কিছু না নূরী।

একটা কিছু হয়েছে যা তুমি আমার কাছে গোপন করে যাচ্ছো?

বনহুর নিশ্চুপ।

নূরী বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে—হুর, আজও আমি তোমাকে চিনতে পারলুম না। কোথায় যেন কি হয়েছে তোমার!

একটি কথা তোমাকে বলবো যা তোমাকে ভীষণ আঘাত দেবে।

তোমার জন্য আমি সব আঘাত হাসিমুখে গ্রহণ করবো। তুমি বল?

আজ নয়, আর একদিন শুনো।

না, আজই তোমাকে বলতে হবে হুর—বল, বল তুমি?

নূরী, তুমি যা চাও, জীবনে হয়তো আমার কাছে তা পাবে না।

হুর!

হ্যাঁ নূরী, তোমার এ পবিত্র ভালবাসার বিনিময়ে আমি তোমায় কিছু দিতে পারিনি।

প্রতিদান তো আমি চাই না হুর, তোমাকে পেয়েছি এই আমার যথেষ্ট।

বনহুর নূরীর দীপ্ত উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়। আর কিছু বলার মত খুঁজে পায় না বা সাহস হয় না তার। নূরীর অপরিসীম ভালবাসাকে বনহুর প্রত্যাখ্যান করে চলেছে। তবু নূরীর মনে নেই এতোটুকু বিরক্তির আভাস বা সন্দেহের ছোঁয়াচ। বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল।

❑

সেই রাত্রি ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে যখন জানতে পারলো মনিরা পুলিশ সুপার আহম্মদ এবং ইন্সপেক্টর সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে আজ রাতে দস্যু বনহুরকে আক্রমণ করেছিল এবং সে আহত অবস্থায় পালিয়ে গেছে। আরও শুনলো মনিরা, তাদের বাগানের পাশে দস্যু বনহুরের রক্ত তখনও জমাট বেধে রয়েছে।

মনিরার অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। তার মাথায় কে যেন বজ্রাঘাত করল।

চৌধুরী সাহেব যদিও অতি কষ্টে নিজকে সংযত করে রাখলেন, তবু তাঁর মনেও দারুণ ব্যথা অনুভব করলেন। মরিয়ম বেগম তো গোপনে অশ্রুবিসর্জন করে চললেন। নামাজের কক্ষে প্রবেশ করে কোরআন শরীফ খুলে বসলেন। চোর ডাকু দস্যু যাই হোক, তবু সে তাদের সন্তান। মায়ের প্রাণ আকুল হয়ে উঠল। খোদার দরগায় মোনাজাত করতে লাগলেন হে খোদা, আমার মনিরকে তুমি মঙ্গলমত রেখ!

মনিরা চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে চলল। না জানি ওর কোথায় গুলী লেগেছে? না জানি কেমন আছে। সে বেঁচে আছে কিনা, তাই বা কে জানে! অস্থির হৃদয় নিয়ে ছটফট করতে লাগলো সে। বনহুরের এ দুর্ঘটনার জন্য সে-ই যেন দায়ী। কেন সে ওকে আসতে অনুরোধ জানিয়েছিল! তার সঙ্গে দেখা করবে বলেই তো আসছিল বনহুর। বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদে মনিরা। সে কান্নার যেন শেষ নেই। নিরুপায় মনিরা বনহুরের কোন সন্ধান জানে না—কোথায় থাকে সে। শহরের পূর্বের বাড়িখানা এখন আর বনহুরের নেই। পুলিশ সে বাড়িখানা দখল করে নিয়েছিল, এখন অবশ্য তার মামু চৌধুরী সাহেবের হেফাজতেই রয়েছে। তবে শহরের অন্য কোথাও যে বনহুরের কোন গোপন বাড়ি আছে, জানে মনিরা। কিন্তু কোথায় তা জানে না সে। বনহুরের

এখনও দুটো নতুন মোটর গাড়ি রয়েছে। সে গাড়িগুলো শহরের সেই গোপন বাড়িখানাতেই থাকে। মনিরা অনেকদিন এ বাড়িখানার ঠিকানা চেয়েও জানতে পারেনি বনহুরের কাছে। নইলে সে এতোক্ষণ সেই বাড়িখানাতে গিয়ে হাজির হত।

একদিন দু'দিন করে যখন প্রায় সপ্তাহ কেটে গেল, তখন মনিরার অবস্থা মর্মান্তিক হয়ে পড়লো। নাওয়া খাওয়া নেই। পাগলিনীর মত হয়ে পড়লো মনিরা। চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম চিন্তিত হলেন। যদিও তাঁদের মনেও দারুণ অশান্তি ছিলো, তবু মনিরার জন্য আরও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

মনিরা দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়লো। ওর মনে সদা ভয়—আর সে বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আসতো কিংবা কোনো সংকেত জানিয়ে দিত—আমি ভাল আছি।

ক্রমে হতাশ হয়ে পড়লো মনিরা। সেই দিনের ফুলের মালাটা ছবির গলায় শুকিয়ে গেছে। ছবির দিকে তাকিয়ে মনিরার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

মনিরা ভাবে—শিশুকালে তার জীবন থেকে যে হারিয়ে গিয়েছিল, আবার কেনই বা সে ফিরে এসেছিল তাকে কি শুধু কাঁদাবার জন্যই এসেছিল ও!

এ কথা মিথ্যে নয়, যে নারী বনহুরকে ভালবেসেছে তাকেই কাঁদতে হয়েছে। কেউ ওকে ধরে রাখতে পারেনি কোন দিন। বনহুরকে কেউ মায়ার বন্ধনে বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়নি। শুধু মনিরাই নয়, দস্যু বনহুরকে ভালবেসে অনেককেই কাঁদতে হয়েছে। কিন্তু বনহুরের মনে আজও কেউ রেখাপাত করতে পারেনি একমাত্র মনিরা ছাড়া।

তবু মনিরাকেও মাঝে মাঝে বিস্মৃত হয়ে যায় বনহুর। ভুলে যায় সে গোটা দুনিয়াকে, নিজের মধ্যে যখন চাড়া দিয়ে উঠে তার উন্মত্ত দস্যুভাব।

মনিরা যতই বনহুরের কথা চিন্তা করে চলে ততই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। জ্বর দেখা দেয় ওর শরীরে।

মরিয়ম বেগম স্বামীকে ডাক্তার ডাকতে বলেন। চৌধুরী সাহেব তাঁর বাল্যবন্ধু ডাক্তার সেনকে কল করলেন।

ডাক্তার সেন এলেন এবং মনিরাকে পরীক্ষা করে বললেন, অসুখ এর শরীরে নয়, মনে। কাজেই এর জ্বরটা স্বাভাবিক নয়। তবু আমি ঔষধপত্র দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি প্রেসক্রিপশন করে উঠে যান ডাক্তার সেন।

চৌধুরী সাহেব ডাক্তার সেনের তাড়াহুড়ো দেখে বলেন, এতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন জয়ন্ত? অনেকদিন পর এসেছ, তবু স্বেচ্ছায় নয়, ডেকে এনেছি; অথচ চা না খেয়ে যেতে চাও?

না ভাই, আজ আমি বিলম্ব করতে পারছিনে, দেখছো তো সন্ধ্যা হয়ে এলো। আর একদিন সকাল সকাল আসবো।

হেসে বললেন চৌধুরী সাহেব, রাতকে এতো ভয় কেন ডাক্তার?

ডাক্তার সেন ভয়াতুর কণ্ঠে বলে উঠলেন—রাতকে আমি খুব ভয় করি।

তার মানে?

সেদিন যা এক বিভ্রাটে পড়েছিলুম।

কি হয়েছিল?

সাংঘাতিক এক কাণ্ড! শোন তবে বলছি—কিছুদিন আগে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে।

রাতে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়েছি, হঠাৎ তিনটে কিংবা সাড়ে তিনটে হবে একটি যুবক গাড়ি নিয়ে হাজির। সাংঘাতিক এক্সিডেন্ট; এক্ষুণি যেতে হবে। জানোই তো, আমি রাতে কোথাও যাইনে। তবু যুবক নাছোড় বান্দা। বাধ্য হয়েই গেলুম। তারপর কি জানো, সে এক বিস্ময়কর ঘটনা।

চৌধুরী সাহেব বললেন—তোমার কাহিনীটা দেখছি বেশ রস [illegible] ধরনের। [illegible] খেতেই শোনা যাবে। চলো হল ঘরে যাই। তারপর বৃদ্ধ চাকর নকিবকে ডাকতে শুরু করেন তিনি—নকিব, নকিব.....

একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে নকিব এসে দাঁড়ালো।

চৌধুরী সাহেব ওর দিকে তাকিয়ে প্রথম আশ্চর্য কণ্ঠে বললেন—সেকি, এই গরমের দিনে কম্বল কেন গায়ে দিয়েছিস?

কাঁপা গলায় বললো নকিব—জ্বর হয়েছে।

তবে তুই এলি কেন?

আপনি যে ডাকলেন।

শোন, বাবুর্চিকে বল হলঘরে দু'কাপ চা আর নাস্তা পাঠিয়ে দিতে। আর শোন এই ঔষধটা দেখছিস-এটা এক্ষুণি মনিরাকে এক দাগ খাইয়ে দে।

আচ্ছা।

চৌধুরী সাহেব আর ডাক্তার সেন মনিরার কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান।

বৃদ্ধ নকিব এবার টেবিল থেকে ঔষধের শিশি আর ছোট্ট গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে মনিরার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

মনিরা খেঁকিয়ে উঠে—ভাগ হতভাগা, ঔষধ আমি খাবো না।

নকিব দাঁড়ি নেড়ে বললো—খেতেই হবে তোমাকে।

আবার কথা বলছিস...

নকিব তবু গেলাসে ঔষধ ঢাললো।

মনিরা ওর হাত থেকে ঔষধ নিয়ে ঢেলে ফেললো পাশের ফুলদানিতে; তারপর বললো—আমি বলছি আমার কোন অসুখ হয়নি, তবু ঔষধ খেতে হবে।

নকিব এক নজরে তাকিয়ে ছিল মনিরার মুখের দিকে।

মনিরা বলে উঠে—অমন হা করে আমার মুখে কি দেখছিস শুনি?

তোমার দেখছি আপামনি...

বের হয়ে যা বলছি ...

যাচ্ছি যাচ্ছি আপামনি, কিন্তু ...

আর কিছু নয়, শীগগির বের হয়ে যা।

নকিব বেরিয়ে যায়, যাবার আগে আর একবার মনিরার দিকে ফিরে তাকায়।

নকিব বেরিয়ে যেতেই, মনিরা শয্যা ত্যাগ করে চুপি চুপি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে, তারপর সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়াল দরজার আড়ালে।

ডাক্তার সেন বলছেন—গাড়িখানা আমাকে নিয়ে শহরের এক [illegible] গিয়ে থামলো। ঠিক সেই মুহূর্তে পিঠে একটা ঠাণ্ডা কিছু অনুভব করলুম; ফিরে দেখি, যুবকটা আমার পিঠে রিভলভার চেপে ধরেছে।

চৌধুরী সাহেব আর্ত কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করে উঠেন বল কি?

এমন সময় নকিব চায়ের ট্রে হস্তে মনিরার পিছনে এসে দাঁড়ায়-দরজা ছাড়ুন আপামনি, চা-নাস্তা নিয়ে যাব।

চমকে সরে দাঁড়ায় মনিরা, ঠোঁটের উপর আংগুল চাপা দিয়ে বলে—চুপ! খবরদার, আমার কথা বলবিনে।

না গো না, বলবো না। কিন্তু এখানে লুকিয়ে কি শুনছো?

সে তুই বুঝবিনে, তুই যা।

নকিব একবার আড়নয়নে মনিরার দিকে তাকিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে।

ডাক্তার সেন বলে চলেছেন—আমি বিবর্ণ হয়ে গেলাম। তখন আমার মনের অবস্থা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। ধীরে ধীরে হাত তুলে বললাম। যুবক এবার আমার চোখে একটা কালো রুমাল দিয়ে পট্টি বেঁধে দিল। আরও কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নেওয়া হল। আমি ভয়ানক ঘাবড়ে গেছি দেখে যুবক আমাকে অভয় দিচ্ছিলো, ভয় নেই, আমি আপনার কোন ক্ষতি করবো না।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করলেন চৌধুরী সাহেব—তারপর?

তারপর আমাকে একটি ঘোড়ায় চাপিয়ে নেওয়া হলো। যখন আমার চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হলো তখন দেখলুম, সুন্দর সজ্জিত একটি কক্ষমধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। বাড়িটা যে কোথায়, শহরের কোন প্রান্তে, কিছুতেই বুঝতে পারলুম না। সম্মুখে তাকিয়ে আরও আশ্চর্য হলুম—আমার সামনে শয্যায় শুয়ে এক যুবক। অদ্ভুত সুন্দর তার চেহারা। আমি তাকে ইতোপূর্বে কোথাও দেখেছি বলে মনে হলো না....

নকিব চায়ের ট্রে হাতে দাঁড়িয়েছিল এতোক্ষণ এক পাশে। চৌধুরী সাহেব বলে উঠলেন—হা করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন। চা -নাস্তা এনেছিস?

হ্যাঁ! রাখব?

রাখবি নাতো কি দাঁড়িয়ে থাকবি?

নকিব চায়ের কাপ আর নাস্তার প্লেট টেবিলে সাজিয়ে রাখছিল। চৌধুরী সাহেব বলে উঠলেন—কম্বলটা খুলবিনে আজ?

নকিব বলে উঠলো—বড্ড শীত করছে।

তবে ডাক্তারকে হাতটা দেখানা। ঔষধ পাঠিয়ে দেবে।

না, না ওসব জ্বর-ঔষধ লাগবে না সাহেব। একটু তেঁতুল গোলা পানি খেলেই সেরে যাবে।

যা তবে এখান থেকে।

বেরিয়ে যায় নকিব।

চৌধুরী সাহেব নিজে একটি কাপ হাত উঠিয়ে নিয়ে বললেন— নাও আরম্ভ কর। খেতে খেতেই গল্প শোনা যাবে।

ডাক্তার সেনও চায়ের কাপ তুলে নেন।

চৌধুরী সাহেব বলে উঠলেন—সেকি, ওগুলো খাবে না?

না ভাই, বিকেলে পেট পুরে নাস্তা করেছি। চা টুকু খাব।

আচ্ছা, তাই খাও।

ডাক্তার সেন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন—

হ্যাঁ, কি বলছিলুম যেন?

চৌধুরী সাহেব বললেন—ইতোপূর্বে তাকে কোথাও দেখনি বলে তোমার মনো হলো....

হ্যাঁ, তাকে কোথাও দেখিনি। যে তরুণ আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল সে বললো—এই যে রোগী-আপনি দেখুন। আমি দেখলুম, যুবকের বাম হস্তে আঘাত লেগেছে এবং আঘাতটা স্বাভাবিক নয়—গুলীর আঘাত।

চৌধুরী সাহেব ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছেন; তিনি ডাক্তার সেনের কথায় বেশ বুঝতে পারলেন, যার কথা ডাক্তার সেন বলে চলেছেন, সে-ই তার পুত্র মনির এবং পুলিশের গুলীতে সে-ই আহত হয়েছে। তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন—তারপর কেমন দেখলে তাকে?

দেখলুম প্রচুর রক্তপাত হয়েছে তার শরীর থেকে ...

মনিরা নিজের অজ্ঞাতে কখন যে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করেছে সে নিজেই জানে না, ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে— থামলেন কেন ডাক্তার সাহেব বলুন--বলুন...

চৌধুরী সাহেব বিস্ময়ভরা চোখে তাকান ভগিনীর মুখে— তুমি আবার এখানে এলে কেন মা?

ডাক্তার সেনও চশমার ফাঁকে অবাক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, মেয়েটি অসুস্থ শরীর নিয়ে কখন আবার এলো। তবু তিনি বলে চললেন.. আঘাতটা তার সাংঘাতিক হয়েছিল। কেউ তাকে গুলীবিদ্ধ করে হত্যা করতে চেয়েছিল....

মনিরা ব্যাকুল আগ্রহে বলে উঠে— তারপর ডাক্তার সাহেব? তারপর? সে ভালো আছে তো?

ডাক্তার সেন বলতে বলতে থেমে পড়লেন। তিনি বিস্ময়ভরা গলায় বলেন— চৌধুরী সাহেব, আপনার ভগিনীকে বড় উত্তেজিত মনে হচ্ছে, ব্যাপার কি?

পরে তোমাকে সব বলবো। তুমি বলে যাও জয়ন্ত তাকে কেমন দেখলে?

ডাক্তার সেন চৌধুরী সাহেবের কণ্ঠের উদ্বিগ্নতায় মনে মনে আশ্চর্য হলেন। তবুও তিনি বলতে শুরু করলেন—রোগী পরীক্ষা করে দেখলুম তার জন্য প্রচুর রক্তের প্রয়োজন। যে তরুণ আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল সেই রক্ত দিল। প্রচুর রক্ত সে দিল—আশ্চর্য, তরুণটি এতোটুকু ঘাবড়ালো না। তারপর আমি সুন্দর করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলুম।

চৌধুরী সাহেব বলে উঠলেন—সে তো আরোগ্য লাভ করবে?

এবার ডাক্তার সেনের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠে, বলেন তিনি—চৌধুরী তুমি তার আসল পরিচয় জানো না, তাই অতো আগ্রহান্বিত হচ্ছো। আগে যদি জানতুম কে সে, তাহলে—তাহলে আমার কাছে যে মারাত্মক ইনজেকশান ছিল তারই একটি এম্পল--বাস, তাহলেই একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যেতো...

হঠাৎ মনিরা আর্তকণ্ঠে একটা শব্দ করে উঠে—উঃ।

ঢোক গিলে বলেন চৌধুরী সাহেব—কেন, কেন তুমি তাকে হত্যা করবে ডাক্তার। সে তোমার কাছে কি অপরাধ করেছিল?

জানো না চৌধুরী কে কে সে, যাকে অহরহ পুলিশ বাহিনী অনুসন্ধান করে চলেছে। যে দস্যুর ভয়ে আজ গোটা দেশবাসী প্রকম্পমান, যে দস্যু হাঙ্গেরিয়া কারাগার থেকে পালিয়েছে— ঐ যুবক সেই দস্যু বনহুর।

চৌধুরী সাহেব এটা পূর্বেই অনুমান করেছিলেন। তিনি ডাক্তার সেনের কথায় এতোটুকু চমকান না। স্থির কণ্ঠে বললেন—ডাক্তার বিনা দোষে একটি সুন্দর জীবন নষ্ট করতে তোমার হাত কাঁপতো না!

হেসে উঠেন ডাক্তার সেন—যে দস্যুকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় পুলিশের নিকটে পৌঁছাতে পারলে লাখ টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে, তাকে হত্যা করতে হাত কাঁপবে—কি যে বল?

ডাক্তার, লাখ টাকা—লাখ টাকা আমি তোমায় দেব, তুমি আমাকে ঐরকম একটি সন্তান এনে দিতে পার? এক লাখ দু'লাখ যা চাও তাই দেব, তবু পারবে—পারবে অমনি একটি জীবন আমাকে এনে দিতে?

চৌধুরী তুমি দস্যু বনহুরকে চেনো না, তাই ওসব বলছো।

ডাক্তার ওকে আমি যেমন চিনি তেমনি আর কেউ চেনে না। দস্যু বনহুর আমার সন্তান....

চৌধুরী! ডাক্তার সেনের দু'চোখ কপালে উঠে।

চৌধুরী সাহেব বলেন— হ্যাঁ, হ্যাঁ ডাক্তার , তোমার কাছে আমার যে সন্তানের গল্প করেছিলুম, ঐ আমার হারিয়ে যাওয়া রত্ন।

সত্যি বলছো?

হ্যাঁ, সত্যি বলছি।

ডাক্তার সেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন চৌধুরী সাহেবের মুখের দিকে।

নকিব তখন টেবিল থেকে চায়ের কাপগুলো উঠিয়ে নিচ্ছিলো।

ডাক্তার সেন চৌধুরী বাড়ি থেকে বিদায় গ্রহণ করে বাসায় না ফিরে সোজা চললেন পুলিশ অফিসে। দস্যু বনহুর চৌধুরী পুত্র—এতোবড় একটা কথা তিনি কিছুতেই হজম করতে পারছিলেন না! বাল্যবন্ধু হয়েও ডাক্তার সেন চললেন তাঁর ক্ষতিসাধন উদ্দেশ্যে। ভাবলেন, এই কথাটা পুলিশকে জানিয়ে কিছুটা বাহাদুরী নেবেন।

ডাক্তার সেনকে হন্তদন্ত হয়ে পুলিশ অফিসে প্রবেশ করতে দেখে এগিয়ে আসেন মিঃ হারুন-ব্যাপার কি ডাক্তার সেন?

ডাক্তার সেন চাপা কণ্ঠে বলেন—একটা গোপন কথা আছে।

কি কথা, দস্যু বনহুর আবার আপনার ল্যাবরেটরীতে এসে ছিল নাকি?

এমন সময় ডাক্তার সেনের ড্রাইভার এসে বলে—স্যার আপনার সিগারেট কেসটা..

ডাক্তার সেন পকেট হাতড়ে বলেন— তাইতো দাও।

ড্রাইভার বেরিয়ে যায়। যাবার সময় তার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে।

ডাক্তার সেন সিগারেট কেসটা পকেটে রেখে বলেন—দস্যু বনহুর আমার ল্যাবরেটরীতে আসেনি। কিন্তু তার চেয়েও অত্যধিক বিস্ময়কর ঘটনা।

বলেন কি? দস্যু বনহুরের আবির্ভাবের চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা?

হ্যাঁ। চলুন কোন গোপন স্থানে গিয়ে বসি। কথাটা যাতে কেউ শুনতে না পায়।

উঠে দাঁড়ান মিঃ হারুন—চলুন।

মিঃ হারুন ও ডাক্তার সেন পাশের কক্ষে গিয়ে মুখোমুখি বসলেন। ডাক্তার সেন কক্ষের চারিদিকে তাকিয়ে বললেন—দেখবেন কথাটা আমি বলছি-এ কথা যেন কেউ জানতে না পারে বা প্রকাশ না পায়।

না না, তা পাবে না, আপনি নিঃসন্দেহে বলতে পারেন।

কারণ সে আমার বাল্যবন্ধু। হাজার হলেও আমি প্রকাশ্যে তার অন্যায় করতে পারিনে। সে তাহলে মনে ভীষণ ব্যথা পাবে।

আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন ডক্টর সেন। আপনার বিষয়ে কোন কথাই প্রকাশ পাবে না।

সত্যি ইন্সপেক্টর আমি ভাবতেও পারিনি এটা সম্ভব। এ যে একেবারে কল্পনাতীত।

বলুন না কি বলতে চান? এবার মিঃ হারুনের কণ্ঠে বিরক্তির ছাপ।

চৌধুরী সাহেবকে চেনেন তো?

হ্যাঁ, তাঁকে না চেনে এমন জন আছে বলুন?

চৌধুরী সাহেব আমার বাল্যবন্ধু ...

একথা আপনি পূর্বেই বলেছেন।

আমি তাকে অত্যন্ত ভালবাসি এবং সমীহ করি তাই..

দেখুন যা বলতে এসেছেন তাই বলুন ডক্টর সেন। সময় আমাদের অতি অল্প কিনা!

হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলবো কিন্তু দেখবেন আমিই যে কথাটা বলেছি একথা যেন চৌধুরী সাহেব জানতে না পারে।

পারবে না, পারবে না বলুন।

দস্যু বনহুর চৌধুরী সাহেবের সন্তান।— কথাটা বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মিঃ হারুনের মুখের দিকে।

কিন্তু মিঃ হারুনের মুখোভাবে এতোটুকু পরিবর্তন দেখা গেল না। কারণ একথা নতুন নয়। পুলিশ মহলে সবাই একথা জানেন। দস্যু বনহুর যে চৌধুরী সাহেবের একমাত্র হারিয়ে যাওয়া সন্তান মনির—একথা আজ নতুন শোনেন নি। কাজেই তিনি মৃদু হেসে বললেন—ডক্টর সেন, আপনি যে এতো কষ্ট করে এই কথা জানাতে এসেছেন এজন্য আমি দুঃখিত। কারণ একথা আমরা পূর্ব হতেই জানি।

বিস্ময়ভরা গলায় বলে উঠেন ডাক্তার সেন—জানেন! দস্যু বনহুর চৌধুরী পুত্র—এ কথা আপনারা জানেন?

হ্যাঁ ডক্টর সেন শহরবাসিগণ না জানলেও পুলিশ মহল একথা জানে।

আপনারা জেনেও চৌধুরীকে কিছু বলছেন না কেন?

পুত্রের অপরাধে পিতা অপরাধী নয় ডাক্তার সেন। আপনার পুত্র যদি খুনী হয় তার জন্য আপনাকে আমরা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাতে পারিনে। উপরন্তু সে এখন তার বাড়ির লোক নয়। আপনি আসতে পারেন।

ডাক্তার সেনের মুখমণ্ডল মলিন বিষণ্ন হয়ে পড়লো। মনে মনে লজ্জিতও হলেন তিনি। ভেবেছিলেন, মস্ত একটা বাহাদুরী পাবেন কিন্তু উল্টো ফল ফললো। উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার সেন... আচ্ছা, চলি তা হলে।

আচ্ছা আসুন। মিঃ হারুনও উঠে দাঁড়ালেন—গুড নাইট।

ডাক্তার সেন চলতে চলতে বলেন—গুড নাইট।

ডাক্তার সেন গাড়ির নিকটে পৌঁছতেই ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরে। ডাক্তার সেন পিছন আসনে উঠে বসে বলেন—আমার ল্যাবরেটরীতে চলো।

আচ্ছা। ড্রাইভার তার আসনে উঠে বসে ষ্টার্ট দেয়।

গাড়ি ছুটে চলেছে। ডাক্তার সেনের মনে একটা গভীর চিন্তাধারা বয়ে যাচ্ছিলো। তিনি অন্যমনস্কভাবে গাড়িতে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন।

হঠাৎ ব্রেক কষার শব্দে সম্বিত ফিরে পান ডাক্তার সেন। একি! এ যে এক অন্ধকার গলিপথ।

ডাক্তার সেন বলেন—ড্রাইভার এ কোথায় এসে পড়েছ?

ততক্ষণে ড্রাইভার নেমে এসেছে গাড়ির পাশে। অন্ধকারে চক চক করছে তার হস্তে কালোমত একটা কি যেন। যদিও জিনিসটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না, তবু ডাক্তার সেন বুঝতে পারলেন সেটা কি। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠে তার মুখমণ্ডল। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেন—ড্রাইভার, তোমার মতলব?

চাপা কণ্ঠে বলে উঠে ড্রাইভার—নেমে আসুন।

ডাক্তার সেন চমকে উঠলেন, এ তো তাঁর ড্রাইভারের গলার আওয়াজ নয়, তবে কে—কে এ লোক তাঁর ড্রাইভারের বেশে তাঁর সঙ্গে ছলনা করছে! রাগত কণ্ঠে বললেন—কে তুমি?

অন্ধকারে একটা হাসির শব্দ শোনা যায়—আমি কে, জানতে চান?

হ্যাঁ, বল কে তুমি?

যার কথা এই মাত্র পুলিশ অফিসে বলে এলেন—আপনার বন্ধু-সন্তান।

দস্যু বনহুর?

হ্যাঁ ডাক্তার সেন, সেদিন আপনি যে ভুল করেছেন তার জন্যই প্রস্তুত হয়ে এসেছি, যদি আমার পরিচয় সেদিন জানতেন তবে একটি ইনজেকশান— তা হলেই বাস আমাকে আপনি ঠান্ডা করে দিতেন না?

এসব তুমি কি করে জানলে?

আপনার পাশেই তখন ছিলুম আমি, যখন আপনি চৌধুরী সাহেবের নিকট কথাবার্তা বলছিলেন—

বল কি? কই কোথাও তো তোমাকে দেখলুম না?

নকিব! নকিবকে দেখেছিলেন?

তুমি—তুমিই নকিবের বেশে...

হ্যাঁ ডাক্তার সেন। যাক যা বলার জন্য এখানে এসেছি, বলছি শুনুন।

ঢোক গিলে বলেন ডাক্তার সেন—বল?

আমার হাতের ক্ষত এখনও সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়নি, এখন কি করতে হবে দেখবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, কোনো রকম চালাকি করতে গেলে মরবেন। চলুন আপনার ল্যাবরেটরীতে।

গাড়ি যখন ডাক্তার সেনের ল্যাবরেটরীর সম্মুখে গিয়ে পৌঁছল, তখন রাত প্রায় একটা বেজে গেছে। কারণ, রাত বাড়াবার জন্যই বনহুর রাস্তার অলিগলি ঘুরেফিরে বিলম্ব করে তবেই এসেছে।

ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ করে ডাক্তার সেন তাঁর ঔষধের বাক্স খুললেন। তারপর বনহুরকে একটা সোফায় বসতে বলে চারিদিকে তাকালেন, মনোভাব—হঠাৎ যদি এই সময় কেউ এসে পড়তো তাহলে বনহুরকে হাতেনাতে ধরে লাখ টাকা পুরস্কার পেতেন।

বনহুর ডাক্তার সেনের মনোভাব বুঝতে পেরে হেসে বলে ডাক্তার সেন, আপনি ডাক্তার, আপনার কর্তব্য রোগীর চিকিৎসা করে তাকে আরোগ্য করে তোলা। আপনি তার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবেন। কিন্তু কোন রকম চালাকি করতে গেলে...

না না, আমি দেখছি। ডাক্তার সেন বনহুরের হাতখানা তুলে নিয়ে পটি খুলতে থাকেন। ক্ষত পরীক্ষা করে বলেন— এই তো সেরে গেছে, আর সামান্য ক'দিন—তাহলেই সম্পূর্ণ সেরে যাবে। মনোভাব গোপন করে ঔষধ লাগিয়ে পুনরায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দেন।

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে একশত টাকার দু'খানা নোট বের করে টেবিলে রাখে, তারপর রিভলবার উদ্যত করে পিছু হটে বেরিয়ে যায়।

ডাক্তার সেন হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকেন। দস্যু বনহুর দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

❑

সুভাষিনীকে নিয়ে বড় দুশ্চিন্তায় পড়লো চন্দ্রাদেবী। বাড়ির আর কেউ না জানুক চন্দ্রাদেবী জানে-সুভাষিনীর কি হয়েছে। আজ কতদিন হলো সুভাষিনী ধ্যানগ্রস্থার মত স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সুভাষিনীর পিতা মনসাপুরের জমিদার বাবু কন্যার জন্য ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। মা জ্যোতির্ময়ী দেবীর অবস্থাও তাই। সমস্ত মনসাপুরে জমিদার কন্যার এই অদ্ভুত অসুস্থতার কথা ছড়িয়ে পড়লো। সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লো। ডাক্তার বৈদ্য সুভাষিনীর কিছুই করতে পারলো না।

একদিন চন্দ্রাদেবী শাশুড়ির নিকটে গিয়ে বললো—মা, সুভার জন্য এতো চিন্তা ভাবনা করে কোন ফল হবে না। ওর অসুখ শরীরের নয়—মনের। কন্যার যদি মঙ্গল চান তবে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করুন।

জ্যোতির্ময়ী দেবী পুত্রবধুর কথাটা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেন—এ কথা মিথ্যে নয়। ডাক্তার বৈদ্য সবাই বলেছেন মেয়ের কোন রোগ নেই, অথচ দিন দিন সে এমন হয়ে যাচ্ছে কেন। এবার তিনি যেন অন্ধকারে আলোর সন্ধান পেলেন। হ্যাঁ, বিয়ে দিলে হয়তো ওর মনের অবস্থা ভালো হবে। স্বামীকে কথাটা তিনি জানালেন।

জমিদার বজ্রবিহারী রায় কথাটা ফেলতে পারলেন না। এতোদিন তিনি এ বিষয়ে চিন্তাই করেননি। পিতা মাতা মনে করতেন তাঁদের কন্যা এখনও বালিকা রয়েছে। অবশ্য এ ধারণার কারণ ছিল অনেক। একে একমাত্র কন্যা, তারপর সুভাষিনী ছিল খুব আদুরে এবং চঞ্চলা—পিতামাতার কাছে সে ছোট্ট বালিকার মতই আব্দার করত। যাক, এবার বজ্রবিহারী রায় সুপাত্রের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন।

জমিদার কন্যা, উপরন্তু অপরূপ রূপবতী সুভাষিনীর জন্য সুপাত্রের অভাব হলো না। মাধবগঞ্জের জমিদার বিনোদ সেনের পুত্র মধু সেনের সঙ্গে সুভাষিনীর বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল।

সেদিন দ্বিপ্রহরে চন্দ্রাদেবী নিজের ঘরে কোন কাজে ব্যস্ত ছিল, এমন সময় সুভাষিনী তার কক্ষে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিল।

হেসে বললো চন্দ্রাদেবী—সুভা, ওকি হচ্ছে? আমাকে এভাবে ঘরে আটকাবার মানে কি?

সুভাষিনী গম্ভীর বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো—বৌদি, এসব তোমরা কি করছো?

তার মানে?

—ন্যাকামি কর না। আমি জানি, এসব তোমারই চক্রান্ত।

সুভা বস তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। হাত ধরে সুভাষিনীকে পালঙ্কে বসিয়ে নিজেও

বসে পড়ে চন্দ্রাদেবী তার পাশে। আচ্ছা সুভা, যাকে কোনদিন পাবিনে তার জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিবি?

এ প্রশ্ন কি তুমি আজ নতুন করছো বৌদি? তোমাকে আমি বলেছি, আমার গোটা অন্তর জুড়ে ঐ একটি মাত্র প্রতিচ্ছবি আঁকা হয়ে রয়েছে যা কোনদিন মুছবার নয়।

সুভা, খামখেয়ালিপনার একটা সীমা আছে। বিয়ে তোকে করতেই হবে। তখন দেখবি সব ধীরে ধীরে ভুলে যাবি। তাছাড়া তুই যা তা ঘরের মেয়ে নস্—সামান্য একজন দস্যুকে ভালবাসা তোর শোভা পায় না।

বৌদি।

সুভা, বিয়ে তোকে করতেই হবে। বিনোদ সেনের পুত্র মধু সেনকে আমি নিজের চোখে দেখেছি। চমৎকার চেহারা, স্বভাব চরিত্র ভালো...

চন্দ্রাদেবীর কথাগুলো সুভাষিণীর কানে পৌছাচ্ছিল না। সে নিশ্চুপ বসে রইল; দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রুধারা।

যতই বিয়ের দিন এগিয়ে আসতে লাগলো, ততই সুভাষিণী মরিয়া হয়ে উঠলো। বনহুরের মুখখানা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে লাগলো তার হৃদয়পটে। সুভাষিণী এ বিয়ে কিছুতেই করবে না—যেমন করে হোক, বিয়ে তাকে বন্ধ করতে হবে। কিন্তু কি করে বন্ধ করবে সে।

বাড়ির সবাই একমত। একমাত্র বৌদি ছিল তার ভরসা সেও এখন তার বিপক্ষে। কি করে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

সুভাষিণী জানে যাকে নাকি ধ্যান করা যায়, একদিন না একদিন তার দর্শনলাভ ঘটে। সুভাষিণী কিছু চায় না, শুধু আর একটি দিন তার দেখা পাবে, এই আশায় বুক বেঁধে প্রতীক্ষা করছে সে। সুভাষিণী বলেছিল, আবার কবে আপনার দেখা পাব? জবাবে বলেছিল বনহুর ঈশ্বর না করুন আবার যদি এমনি কোন বিপদে পড়েন তখন ..মুহূর্তে সুভাষিণীর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠে। বিপদই তাকে বেছে নিতে হবে। পালাবে সুভাষিণী। যেদিকে তার দুচোখ যায় পালাবে সে। তাহলে এ বিয়ে থেকে ও পরিত্রাণ পাবে। ...

সুভাষিণী বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে। দুর্ভেদ্য অন্ধকার গোটা পৃথিবীটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আকাশে মেঘ জমাট বেঁধে রয়েছে—এই বুঝি আকাশটা ভেংগে বৃষ্টি নামবে।

সুভাষিণী বেরিয়ে পড়লো। কোনদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। দ্রুত এগিয়ে চললো সে। ভোর হবার পূর্বেই পিতার জমিদারী ছেড়ে পালাতে হবে, নইলে তার রেহাই নেই।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো অবিরাম বৃষ্টি। বড় বড় বৃষ্টির ফোটাগুলো সুভাষিণীর শরীরে সূঁচের মত বিঁধতে লাগলো। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সুভাষিণী দু'হাতে বুক চেপে ধরে ছুটতে লাগলো।

জমিদারের আদুরে কন্যা সুভাষিণী কোনদিন এতোটুকু দুঃখ সহ্য করেনি। এই রাতদুপুরে দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে সব দুঃখ ভুলে ছুটে চলেছে সে। কতদূর এসেছে কোন দিকে চলেছে, কোথায় চলেছে, কিছুই জানে না সুভাষিণী। বার বার হোচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে সে। আবার উঠছে, আবার ছুটছে; ভাবছে কই সে যে বলেছিল, বিপদমুহূর্তে আবার তুমি আমার দেখা পাবে। কই-কই সে, কোথায় তার দেখা পাব।

কতদূর যে এসে পড়েছে সুভাষিণী নিজেই জানে না। বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। সুভাষিণী ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে একটা গাছের তলায় বসে পড়ে। অতি পরিশ্রমে আর ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে দেহটা তার অবশ হয়ে এসেছিল, অল্পক্ষণেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললো সুভাষিণী।

যখন জ্ঞান ফিরলো চোখ মেলে দেখলো সে একটি বেডে শুয়ে আছে। পাশে দাঁড়িয়ে এক নারী ও একটি পুরুষ কি সব কথাবার্তা বলছে। তাকে চোখ মেলতে দেখে মেয়েটা বলে উঠল—ডক্টর ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে।

এবার সুভাষিণী বুঝতে পারে—সে যেখানে এখন শুয়ে রয়েছে, সেটা একটা হাসপাতাল। মেয়েটার শরীরে নার্সের ড্রেস আর ভদ্রলোকটি ডাক্তার, এ কথা সে একটু পরেই নার্সের মুখের কথায় জানতে পেরেছে।

সুভাষিণী খুশি হতে পারলো না। সে তো বাঁচতে চায়নি চেয়েছিল মরতে, কিন্তু এখানে এলো কি করে!

ততক্ষণ ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করেছেন। পরীক্ষা শেষ করে বললেন—আর কোন ভয় নেই। আপনি ওকে গরম দুধ খেতে দিন।

নার্স গেলাসে খানিকটা গরম দুধ এনে সুভাষিণীকে খেতে দিল।

সুভাষিণী মুখ ফিরিয়ে নিলো—না, আমি খাব না।

নার্স আশ্চর্য কণ্ঠে বললো—কেন খাবেন না?

না, আমি কিছু খাবো না।

নার্স হেসে বলে—ও বুঝতে পেরেছি। স্বামীর উপর অভিমান হয়েছে।

স্বামী!

হ্যাঁ, আপনার স্বামীই তো এখানে রেখে গেছেন আপনাকে।

সুভাষিণী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে নার্সের মুখের দিকে।

নার্স বলে—আপনি দুধটুকু খেয়ে ফেলুন, কোন চিন্তা করবেন না। আপনার স্বামী এসে যাবেন।

এবার সুভাষিণী দুধটুকু এক নিঃশ্বাসে খেয়ে হাতের পিঠে মুখ মুছে বলে—আমি আপনার কথা বুঝতে পারছিনে।

সব বুঝতে পারবেন। আপনার স্বামী একটা চিঠি দিয়ে গেছেন আপনাকে দেবার জন্য আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে চিঠিটা দেব।

সুভাষিণী ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছি। কই চিঠি দিন।

এখন নয়, পরে পাবেন।

না, না এখনই দিন।

কিন্তু এখন তো দেওয়া চলবে না।

দিন আমার অনুরোধ, আপনি দিন...

বুঝেছি স্বামীর চিঠি কিনা....দাঁড়ান এনে দিচ্ছি।

নার্স চলে যায়। একটু পরে একটা গভীর সবুজ রং-এর মুখ আঁটা খাম এনে সুভাষিণীর হাতে দেয়।

দুরু দুরু বক্ষে সুভাষিণী খামখানার মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে মেলে ধরলো চোখের সামনে। মাত্র দু'লাইনে লেখা সুভাষিণী এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললো—

তোমাকে এভাবে দেখবো ভাবতে পারিনি। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যেও।

—দস্যু বনহুর।

সুভাষিণীর চোখ দুটো দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বার বার পড়ছে সে চিঠির দু'ছত্র লেখা। তার ডাকে এসেছিল সে। সাড়া দিয়েছিল..

নার্স বিস্ময় বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে। হেসে বললো— আপনার স্বামীর সঙ্গে রাগারাগি হয়েছে বুঝি?

সুভাষিণী নার্সের প্রশ্নে তাকালো তার মুখে। তারপর আনমনা হয়ে যায়।

নার্স হেসে বলে—সত্যি আপনার স্বামী-ভাগ্য। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমন তার ব্যবহার।

অবিবাহিত নার্সের মনে হয়তো জানার বাসনা জাগে। জিজ্ঞাসা করে—চিঠিতে কি লিখেছেন উনি?

সুভাষিণী কাগজখানা ভাঁজ করে রেখে বলে—লিখেছেন, আসতে বিলম্ব হলে আমি যেন ঘাবড়ে না যাই।

অমন রাজপুত্রের মত স্বামী, একদণ্ড না দেখলে ঘাবড়াবার যে কথাই...

সুভাষিণী একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে—হুঁ।

❑

বনহুর এসে পৌঁছতেই নূরী তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল— হুর, তুমি না বলেছিলে রাতেই ফিরে আসবে?

সে এক অদ্ভুত কাণ্ড নূরী! চলো বলছি।

কি এমন কাণ্ড হল? তোমার কাছে তো দিন-রাত অদ্ভুত কাণ্ডের সীমা নেই।

ঝর্ণার ধারে গিয়ে পাশাপাশি বসে নূরী আর বনহুর। নূরী হেসে বলে—এবার বলো তোমার অদ্ভুত কাণ্ডের কথা।

গত রাতে আমি কোথায় গিয়েছিলুম জান?

জানি, তুমি সেই শয়তান ডাকুর সন্ধানে জম্বুর বনে গিয়েছিলে।

হ্যাঁ, আমি নাথুরামের আড্ডার সন্ধানে জম্বুর বনে গিয়েছিলুম, কিন্তু গত রাতে সেখানে আড্ডা বসেনি। হয়তো শহরের কোন গোপন স্থানে সমবেত হয়েছে ওরা। ফিরে আসছিলুম, পথিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হলো। পথ সঙ্কীর্ণ করার অভিপ্রায়ে জম্বুর বনের ভিতর দিয়ে তাজকে চালনা করছিলুম। বন পেরিয়ে মনসা গ্রামের পাশ কাটিয়ে আসছিলুম—তখন বৃষ্টি প্রায় ধরে এসেছে; মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—গ্রামের ভিতর দিয়ে আসা ঠিক হবে না, তাজের খুরের শব্দে গ্রামবাসীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটতে পারে, তাই মনসাপুরের ওপাশে নাড়ন্দি বনের ভিতর দিয়ে এগুতে লাগলুম। কিছুদূর এগিয়েছি হঠাৎ বিদ্যুতের আলোতে দৃষ্টি গিয়ে পড়লো একটা গাছের নিচে। কি যেন পড়ে রয়েছে। এগিয়ে গেলুম গাছটার দিকে। পুনরায় বিদ্যুৎ চমকালো, আশ্চর্য হলুম-বিদ্যুতের আলোতে দেখলুম একটি নারীমূর্তি পড়ে রয়েছে ভূতলে।

তারপর?

তারপর যখন তার আরও নিকটে পৌঁছলুম তখন আরও আশ্চর্য হলুম।

কেন?

মেয়েটি আমার পরিচিত।

তার মানে?

মানে, মনসাপুরের জমিদার কন্যা সুভাষিণী ...

সেই যুবতী, যাকে তুমি একদিন ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

তারপর কি করলে?

দেখলুম, সুভাষিণী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছে।

তুমি বুঝি বসে রইলে তার পাশে?

না, তাকে তাজের পিঠে উঠিয়ে নিলুম।

সত্যি?

তা নয়তো কি মিথ্যে? তারপর বন থেকে বেরিয়ে এলুম। ততক্ষণে ভোর হয়ে এসেছে। একটা ট্যাক্সি ডেকে তাকে হসপিটালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছি।

এই বুঝি তোমার অদ্ভুত কাণ্ড?

কেন অদ্ভুত নয়? রাত দুপুরে বনের মধ্যে একটি যুবতী মেয়ে...

আর রক্ষাকর্তা হিসেবে হঠাৎ তোমার আবির্ভাব ...

কি জানি নূরী, সবই যেন কেমন বিস্ময়কর ব্যাপার!

বনহুর আর নূরী কথাবার্তা বলছিল, এমন সময় রহমান আসে সেখানে—সর্দার।

বনহুর রহমানকে দেখে বলে—এসেছো; চলো।

নূরী প্রশ্ন করে—আবার কোথায় চললে হুর?

পরে জানতে পারবে। এসো রহমান।

বনহুর আর রহমান চলে যায়।

বনহুরের দরবার কক্ষ।

সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট দস্যু বনহুর। তার প্রধান সহচর রহমান পাশে দাঁড়িয়ে, এবং অন্যান্য অনুচর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে—তোমরা সবাই জান আজ আমাদের দেশ এক মহাসঙ্কটময় অবস্থায় উপনীত হয়েছে। প্রতিবেশী রাজ্য আমাদে রাজ্যের উপর জঘন্য হামলা চালিয়েছে।

জানি সর্দার।

যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। আজ আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য জান-প্রাণ দিয়ে দেশকে রক্ষা করা। শত্রুর কবল থেকে আমাদের মাতৃভূমিকে বাঁচিয়ে নেওয়া। আমরা জীবন পণ সমর্পণ করে দেশকে রক্ষা করবো।

হ্যাঁ সর্দার।

আমরা সব কিছু ত্যাগ করতে পারি, মাতৃভূমি রক্ষার্থে আমরা শরীরের শেষ রক্তবিন্দুও

বিসর্জন দিতে পারি। বিশেষ করে আমাদের মুসলমান ভাইরা আজ মাতৃভূমি রক্ষার্থে আমরণ প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছে। মাতৃভূমি রক্ষার দায়িত্ব শুধু সৈনিকদের নয়, প্রত্যেকটা নাগরিকের কর্তব্য আমাদের দেহের শেষ শক্তি দিয়ে শত্রুকে হটিয়ে দেওয়া।

সর্দার, আমরা সবাই প্রস্তুত।

তোমাদের বেশি করে বলতে হবে না; এই দেশের সন্তান তোমরাও। তোমাদের এখন কি কর্তব্য নিজেরাই জান। আমি এই মুহূর্তে তোমাদের ছুটি দিলুম। তোমরা সবাই ইচ্ছামত মাতৃভূমি রক্ষার্থে আত্মনিয়োগ করতে পারো।

সর্দার!

হ্যাঁ, যত টাকা তোমাদের প্রয়োজন হয়, রহমানের নিকট চেয়ে নিও। এখন আর দস্যুতা নয়, দেশরক্ষার জন্য এখন তোমরা সকলেই ভাই ভাই। তোমাদের কারো দ্বারা কোন নাগরিকের শান্তি ভঙ্গ হবে না—এটাই আমি চাই।

সর্দার, আপনার আদেশ শিরোধার্য।

বনহুর কখন উঠে দাঁড়িয়েছিল, এবার দক্ষিণ পা খানা তার আসনের উপর তুলে দাঁড়ায়— এখন আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য আছে, দায়িত্ব আছে-তোমরা যে যতটুকু পারবে, দেশের জন্য উৎসর্গ করবে। আল্লাহ আমাদের সহায়।

সমস্ত অনুচরবৃন্দ সমস্বরে চিৎকার করে উঠে—মারহাবা!

নূরী আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল, আরও ভালোভাবে কান পাতে।

এবার বনহুর আসন থেকে দক্ষিণ পা নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তারপর বলে—তোমরা যেতে পার। আল্লাহ হাফেজ!

সমস্ত দস্যুগণ বেরিয়ে যায়।

রহমান দাঁড়িয়ে থাকে বনহুরের পাশে। কিছু যেন বলতে চায় সে।

বনহুর বলে—রহমান, আমরা কবে যাচ্ছি?

সর্দার, একটা কথা?

বল?

সর্দার আমরা সবাই যাচ্ছি, তাই বলছিলুম আপনি ...

থামলে কেন বল?

আপনার না গেলে হয় না?

কেন?

ক'দিন আগে আপনার শরীর থেকে প্রচুর রক্তপাত ঘটেছে, তাই বলছিলুম ...

রহমান, তোমার হিত-উপদেশ শুনতে চাইনে। আমি দুর্বল নই।

সর্দার, আপনার কয়েক দিন বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল।

রহমান , তুমি না দস্যু বনহুরের সহচর? তোমার মুখে ও কথা শোভা পায় না। বনহুর বিশ্রাম বলে কিছু জানে না।

লজ্জিত কণ্ঠে বলে রহমান—মাফ করুন সর্দার।

রহমান, কালই আমি যেতে চাই।

কয়েক দিন পরে গেলে চলে না সর্দার?

হাসালে রহমান, যুদ্ধকালে কখনও সময়কাল বিচার চলে না। এখন প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।—রহমান?

সর্দার!

এ কথা নূরী যেন না জানে।

আচ্ছা।

বনহুর বেরিয়ে আসে দরবার কক্ষ থেকে।

নূরী আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই শুনেছিল, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রহর গুণছিল সে। বনহুর যুদ্ধে যাবে, হয়তো আর ফিরে নাও আসতে পারে। কিন্তু তা হয় না। নূরীও যাবে তার সঙ্গে যদি মরতে হয় দু'জন এক সঙ্গে মরবে। কিন্তু সে যে নারী, তাকে কি সঙ্গে নেবে বনহুর? যতই এই নিয়ে ভাবছে ততই নূরীর বুকের মধ্যে একটা ক্রন্দন জমাট বেঁধে উঠছে। এ গহন বনে তার একমাত্র সাথী এবং সম্বল ঐ বনহুর। দুনিয়ায় সে ওকে ছাড়া কিছু বুঝে না। বনহুরই যে তার সর্বস্ব।

নূরী দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে নীরবে চোখের পানি ফেলছিল। এমন সময় বনহুর এসে তার পাশে বসলো। একটা কাঠি দিয়ে নূরীর মাথায় টোকা মেরে ডাকল—নূরী।

নূরী নিশ্চুপ।

বনহুর ওর মাথায় হাত রাখলো—নূরী।

নূরী এবার মুখ তুলে বললো—এতোবড় নিষ্ঠুর তুমি।

হেসে বললো বনহুর—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

নূরী রাগতকণ্ঠে বলে উঠে—শুধু নিষ্ঠুর নও তুমি; তুমি পাথরের চেয়েও কঠিন।

তার চেয়েও শক্ত ....

বনহুর, আমি সব শুনেছি।

তাহলে তো বলার আর কিছু নেই।

পাষণ্ড! তোমার হৃদয় বলে কোন কিছু নেই।

হৃদয়.... হাঃ হাঃ হাঃ, দস্যুর আবার হৃদয় আছে নাকি?

বনহুর, আমি তোমাকে কিছুতেই যুদ্ধে যেতে দেব না।

বনহুর মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে পড়ে—তাই বল। দরবার কক্ষের কথাগুলো তুমি তাহলে সব শুনে নিয়েছ?

নূরীর রুদ্ধ কান্না এতোক্ষণে যেন পথ পায়, দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠে সে।

বনহুর অবাক হয়ে ভাবে, একি মহাসঙ্কট। তবু সান্ত্বনার কণ্ঠে বলে—নূরী তুমি কি মাতৃভূমির সন্তান নও? তুমি কি চাও না দেশের মঙ্গল?

তুমি যেও না। এ গহন বনে তুমি ছাড়া আর যে আমার কেউ নেই...

নূরী, যার কেউ নেই তার আল্লাহ আছেন। দেশ আজ মহা সঙ্কটময় মুহূর্তে উপনীত হয়েছে। এ সময় কারও উচিত নয় নিশ্চুপ হয়ে থাকা। যার যতটুকু সামর্থ্য দিয়ে দেশকে রক্ষা করা সকলের কর্তব্য।

তাহলে আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

তা হয় না নূরী। তোমরা নারী, একেবারে সমর প্রাঙ্গণে যাওয়া তোমাদের চলে না। তুমি

যদি মাতৃভূমি রক্ষার্থে এগিয়ে আসতে চাও, অনেক পথ আছে। রহমান এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করবে।

❑

হঠাৎ যুদ্ধের দামামা বেজে উঠায় সমস্ত দেশ এক মহা সমস্যার সম্মুখীন হল। চারিদিকে শুধু মাতৃভূমি রক্ষার আকুল আহ্বান। যুবক বৃদ্ধ, নারী পুরুষ সবাই দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করে চলেছে, আমরা শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দেব, তবু মাতৃভূমির এক কণা মাটি অন্য দেশকে দেব না। রণ-প্রাঙ্গণে ধ্বনিত হল হাজার হাজার সৈনিকের কলকণ্ঠে লা-ইলাহা ইল্লালাহ শব্দ। তার সঙ্গে গর্জে উঠলো আগ্নেয় অস্ত্রগুলি। সীমান্তের আকাশ ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মরতে লাগলো দু'পক্ষের শত শত লোক। আহতদের আর্তনাদ আর কামানের শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো বসুন্ধরা।

মাতৃভূমির এ আকুল আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলো না বনহুর। মন তার অস্থির হয়ে উঠলো। এ দেশেরই সন্তান সে। জন্মভূমির এ বিপদাপন্ন অবস্থা তাকে চঞ্চল করে তুলল।

যুদ্ধে যাবার পূর্বে মনে পড়লো মনিরার কথা। অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা করেনি; অবশ্য এর কারণ ছিল অনেক। একে সে আহত অবস্থায় বেশ অনেকদিন শয্যাশায়ী ছিল, তারপর নানা ঝামেলায় যাওয়া হয়ে উঠেনি। পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদ এরপর থেকে চৌধুরী বাড়ির চারিপাশে গোপনে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন—এটাও একটা কারণ। তবু যে বনহুর মনিরাকে না দেখে এসেছে, তা নয়। মাঝে আরও একদিন ফকিরের বেশে এসেছিলো সে—তখন মনিরা বেশ অসুস্থ ছিলো।

❑

সেদিন গভীর রাতে একটা শব্দে ঘুম ভেংগে গেল মনিরার। চোখ মেলে চাইতেই আশ্চর্য হল, মুক্ত জানালার পাশে মেঝেতে দাঁড়িয়ে বনহুর। মুহূর্তে উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠলো মনিরার মুখমণ্ডল। ছুটে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো ওর বুকে—মনির! মনির তুমি এসেছো? তারপর উদগ্রীব নয়নে বনহুরের শরীরের দিকে লক্ষ্য করে বলে—কোথায়, কোথায় তুমি আঘাত পেয়েছিলে মনির?

বনহুর জামার হাতা গুটিয়ে দেখায়—ভাগ্যিস গুলীটা আমার হাতের মাংস ভেদ করে চলে গিয়েছিল। তাই আবার তোমার পাশে আসতে পেরেছি।

মনিরা বনহুরের শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতটায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—মনির, এ জন্য আমিই দায়ী। আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করেছেন, এ আমারই সৌভাগ্য। তোমাকে ফিরে পাব, এ আমি ভাবতে পারিনি। চেয়ে দেখ.. বনহুরের ছোটবেলার ছবিখানার দিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বলে মনিরা—সেদিন তোমার জন্য যে মালাখানা গেঁথে রেখেছিলুম, আজ সে মালা শুকিয়ে গেছে।

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেয়; তারপর স্থির কণ্ঠে বলে—মনিরা!

বল?

তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

বিদায়! সে আবার কি?

মাতৃভূমির ডাক এসেছে।

তার মানে?

আমি যুদ্ধে যাচ্ছি।

সেকি!

মনির, আমি দস্যু ডাকু, তাই বলে কি আমি এদেশের সন্তান নই? আমার জন্ম কি এদেশের মাটিতে হয়নি? আজ আমাদের মাতৃভূমির সঙ্কটময় অবস্থা। আর আমি তাঁর একজন সন্তান হয়ে নিশ্চুপ বসে থেকে দেখব?

মনির।

বনহুর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—জানি তুমি ব্যথা পাবে। কিন্তু আমি আশা করি না মনিরা, তুমি আমার চলার পথে বাধার সৃষ্টি করবে।

মনিরা বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলে উঠে—তুমি আমার কণ্ঠরোধ করে দিলে! কেন, কেন তবে এসেছিলে আমার কাছে বিদায় নিতে? না এলেই আমি তো জানতাম না কিছু।

মনিরা!

না, না তুমি কেন আমার মনে নতুন করে আগুন জ্বালাতে এলে! কেন তুমি আমাকে নিশ্চিন্তে থাকতে দিলে না! ছোট বেলায় যখন আমি কিছু বুঝতাম না, ভালবাসা কি জিনিস জানতাম না, তখন তুমি আমার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিলে। ভুলে গিয়েছিলুম তোমার কথা। আবার ধূমকেতুর মত কেন এসেছিলে তবে....

মনিরা, তুমি শিক্ষিতা, তুমি জ্ঞানবতী নারী। আজ এ সময় ওসব কথা স্মরণ করা তোমার পক্ষে উচিত নয়। দেশের ডাকে তোমার প্রাণ কি আকুল হয়ে উঠেনি? তুমি কি চাও না তোমার মাতৃভূমির মান ইজ্জত রক্ষা হউক? আমাদের দেশের প্রতিটি যুবকের কর্তব্য সমর প্রাঙ্গণে গিয়ে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করা। মাতৃভূমি রক্ষার্থে জীবন সমর্পণ করা। আজ ঘরে বসে থাকার সময় নয়। যার যতটুকু সামর্থ্য আছে, তাই দিয়ে দেশকে রক্ষা করা আজ সকলের ধর্ম। মনিরা এ ব্যাপারে তুমিও এগিয়ে আসতে পার।

সত্যি?

হ্যাঁ, জানো না আজ সীমান্তে আমাদের অগণিত সৈনিক ভাইরা প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে চলেছে। তাদের এ চলার পথে এখন বহু জিনিসের প্রয়োজন। টাকা পয়সা, অলঙ্কার রক্ত- যে যা পার, তাই দিয়ে সাহায্য করতে হবে। আমাদের সৈনিক ভাইদের বাহুবল মজবুত করতে হবে।

আমার সমস্ত অলঙ্কার আমি তোমায় দেব।

আমাকে নয় মনিরা সমর তহবিলে দান কর।

আমি রক্ত দেব মনির।

বেশ দিও। ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে, সেখানে তুমি রক্ত দিতে পার।

মনির সত্যি তুমি যুদ্ধে যাবে?

হ্যাঁ।

অভিজ্ঞতা আছে তোমার?

বনহুর মনিরার প্রশ্নে হাসলো, একটু থেমে বললো— দস্যু বনহুরের অজানা কিছুই নেই, মনিরা।

কথার ফাঁকে বনহুর মনিরা খাটের পাশে এসে বসেছিল। বনহুর ওর চিবুক ধরে উঁচু করে তোলে—তুমি আমার জীবনের এখনও কিছু জান না, মনিরা। তোমার মনির কামান চালাতেও জানে।

হ্যাঁ, সত্যি! মনিরা শোন, আজ তোমাকে কয়েকটি কথা বলবো যা আজও কেউ জানে না।

মনিরা বনহুরের পাশে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলে—বল?

চৌধুরী সাহেবের কক্ষ থেকে ভেসে আসে দেয়ালঘড়ির সময় সংকেতধ্বনি ঢং ঢং ঢং—রাত তিনটে বাজলো।

মুনিরা একাগ্রচিত্তে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বলে চলে—আমি যখন সতের বছরের যুবক তখন আমার সমস্ত অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা শেষ হয়ে গেছে। লেখাপড়া স্কুলে ও কলেজে শেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তবে ছোটবেলায় বাপু আমাকে নিজেই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। বাপুর কথা একদিন তোমাকে সব বলেছি। তিনি ছিলেন শিক্ষিত। বাংলা, ইংরেজি, ফারসি সব জানতেন বাপু। আমাকেও তিনি এসব ভাষা লিখতে পড়তে এবং বলতে শিখিয়েছিলেন। সতের বছর বয়সে যখন আমি সবদিকে শিক্ষা লাভ করলাম, তখন বাপু আমাকে প্রথম একদিন সঙ্গে করে শহরে নিয়ে গেলেন। শহরে মোটগাড়ি দেখে খুব ইচ্ছা হল মোটর চালনা শিখবো। বাপু আমার বাসনা জানতে পেরে খুশি হলেন। তিনি আমার জন্য শহরে বাড়ি তৈরি করলেন; গাড়িও কিনে দিলেন—একটি নয় দু'টি। আশা আমার পূর্ণ হলো, ড্রাইভিংও শিখলুম। তবু মনের কোথায় যেন খুঁতখুঁত করতে লাগলো, আরও যেন অনেক কিছু শেখার বাকি আছে। নিজ মনেই ভাবতাম আর কি শেখার আছে। যে-কোন অস্ত্র বিদ্যাই আমার জানা আছে। অশ্বচালনা থেকে মোটর চালনা সব শিখেছি। আর তবে কি বাকি? হঠাৎ মনে পড়লো, এরোপ্লেন চালনা শিখতে পারলে আমার কোন সাধই অপূর্ণ হবে না। বাপুকে একদিন মনের কথা জানালাম।

মনিরা অবাক হয়ে শুনছে বনহুরের কথাগুলো। দু'চোখে তার বিস্ময় উজ্জ্বল দীপ্তি। অস্ফুট কণ্ঠে বললো সে—তারপর?

বাপু কথাটা শুনে গম্ভীর হলেন, কিছুক্ষণ ভেবে বলেন—প্লেন চালনা সকলের পক্ষেই সম্ভব নয়, বনহুর।

আমি বললুম—কেন?

বাপু বলেন—তুমি বুঝবে না।

আমার তখন জেদ চেপে গেছে, কেন বুঝব না। প্লেন—সেকি মানুষ চালায় না? আমিও মানুষ, নিশ্চয়ই পারবো।

বাপু হয়তো আমার মনের কথা জানতে পারলেন। তিনি আমাকে মত দিলেন। তারপর প্লেন চালনাও শিখলাম।

মনিরা বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠে—মনির, তুমি প্লেন চালাতে পার?

শপথ।

সত্যি তুমি কি! কি বলে যে তোমাকে অভিনন্দন জানাব।

মনিরা তুমি হাসিমুখে বিদায় দাও, সেটাই হবে তোমার সত্যিকারের অভিনন্দন।

মনির, যাও তুমি জন্মভূমিকে রক্ষা করে ফিরে এসো।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

স্তব্ধ নির্বাক চোখে তাকিয়ে রইলো মনিরা।

১

সৈনিক ফরহাদের বীরত্বে সমস্ত সামরিক বাহিনী আজ গর্বিত। তার অপরিসীম সাহসিকতায় সবাই মুগ্ধ। ফরহাদের রণকৌশলে শত্রুপক্ষের বিপুল সৈন্য আজ পরাভূত হতে বসেছে। সেনাপতি নাসের আলী তাকে বিপুল উৎসাহ দান করে চলেছেন।

যুদ্ধ চলছে।

শত্রুপক্ষের অসংখ্য সৈন্য বিপুল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ভীষণভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে প্রতিহত করে চলেছে মিত্র পক্ষের সৈন্যগণ।

ফরহাদ প্রাণপণে যুদ্ধ করছে। কখনও রাইফেল হস্তে, কখনও মেশিনগান নিয়ে, কখনও বা কামানের পাশে দাঁড়িয়ে শত্রুপক্ষকে সে পরাহত করে চলেছে। তার অব্যর্থ গুলীর আঘাতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে শত্রুপক্ষের সৈন্যদল।

সেনাপতি নাসের আলী ফরহাদের বীরত্ব এবং রণকৌশলে মুগ্ধ হয়ে তাকে তার সৈন্যবাহিনীর ক্যাপ্টেন করে দিলেন। দক্ষ ক্যাপ্টেনের মত সৈন্য চালনা করতে লাগলো সে

সেদিন অতর্কিতভাবে তাদের ঘাটির উপর শত্রুপক্ষ হামলা করল। এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না সেনাপতি নাসের আলী। তিনি হতভম্বের মত কি করবেন ভাবছেন, কিন্তু তার পূর্বেই তিনি দেখতে পেলেন তাদের কামানগুলো এক সঙ্গে গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল আর মেশিনগানের শব্দও তার সঙ্গে কানে ভেসে এলো আর ভেসে এলো 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি।

সেকি ভীষণ যুদ্ধ!

দুদিন থেকে অবিরাম গুলীবর্ষণ হচ্ছে। সেনাপতি নাসের আলী আশ্বস্ত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তাদের সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত ছিল। তিনি একজন হাবিলদারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—ফরহাদ কোথায়?

হাবিলদার ব্যস্ততার মধ্যেও সুউচ্চ কণ্ঠে জবাব দিলেন—ফরহাদ সাহেব স্বয়ং কামান চালাচ্ছেন। শত্রুপক্ষ তাঁর কামানের গোলার আঘাতে পিছু হটতে শুরু করেছে।

সেনাপতি নাসেরের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠলো। তিনি আদেশ দিলেন—যাও, তাকে তোমরা সবাই মিলে সাহায্য কর।

ফরহাদ অবিরাম গুলীবর্ষণ করে চলেছে। তার গোলার আঘাতে শত্রুপক্ষ অল্পক্ষণেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। এবার তারা রণেভঙ্গ দিয়ে পালাতে বাধ্য হলো! ফরহাদ তবু ক্ষান্ত হলো না, তার সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিল ওদের পিছু ধাওয়া করতে। নিজেও রাইফেল হস্তে অগ্রসর হল।

শত্রুপক্ষের মেজর জেনারেল মিঃ মুঙ্গেরী নিহত হল। আর নিহত হলো তাদের অসংখ্য সৈন্য। অজস্র অস্ত্রশস্ত্রও হস্তগত করলো ফরহাদ।

শত্রুপক্ষ বার বার পরাজিত হয়েও ক্ষান্ত হলো না। তারা গোপনে সন্ধান নিয়ে জানতে পারলো, ক্যাপ্টেন ফরহাদের রণ-নৈপুণ্যে আজ তারা এভাবে পরাজিত হয়ে চলেছে। কিভাবে ক্যাপ্টেন ফরহাদকে নিহত কিংবা বন্দী করা যায়, এ নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলেন শত্রুপক্ষের সামরিক অফিসারগণ।

বার বার অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ফরহাদের সৈন্য বাহিনীকে পরাজিত করার চেষ্টা করতে লাগলো ওরা। কিন্তু কোনক্রমে পেরে উঠলো না ফরহাদের সঙ্গে।

ফরহাদ যেন পূর্ব হতে সব জানতো এবং বুঝতে পারত, কোন দিক দিয়ে আজ শত্রুপক্ষ তাদের ঘাটির উপর হামলা চালাবে সে ভাবে প্রস্তুত থাকত সে।

একদিন শত্রুপক্ষ কৌশলে ফরহাদের সৈন্যবাহিনীকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলল, উদ্দেশ্য ক্যাপ্টেন ফরহাদকে বন্দী কিংবা নিহত করা। অবিরাম গোলা গুলী চালিয়ে ফরহাদের সৈন্যবাহিনীকে কাবু করার চেষ্টা করতে লাগলো তারা।

ফরহাদের সহকারী সৈনিক জব্বার খাঁও আজ ফরহাদের পাশে থেকে তাকে সাহায্য করে চলেছে। সেকি ভীষণ লড়াই! ছোট ছোট টিলার আড়ালে লুকিয়ে গুলী চালাচ্ছে ফরহাদের সৈন্যবাহিনী।

শত্রুপক্ষ একেবারে নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। আজ তারা মরিয়া হয়ে লড়ছে। ফরহাদের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করতেই হবে। ছলে বলে-কৌশলে ফরহাদকে নিহত অথবা বন্দী করতেই হবে।

কিন্তু ফরহাদ নিপুণতার সঙ্গে সৈন্য চালনা করে চলল। জব্বার খাঁ এবং ফরহাদের রাইফেল পুনঃ পুনঃ গর্জন করে চলেছে। তারা ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়ে শত্রুপক্ষের বেষ্টনী পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে লাগলো।

মাথার উপরে প্রচণ্ড সূর্যের তাপ। পায়ের নিচে উত্তপ্ত বালুকা রাশি, ফরহাদের সুন্দর মুখমণ্ডল রক্তাভ হয়ে উঠেছে। পরিধেয় বস্ত্র ঘামে ভিজে চুপসে গেছে। কোনদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। শত্রুসৈন্যকে সে একের পর এক নিহত করে চলেছে। অব্যর্থ তার লক্ষ্য। কখনও হামগুড়ি দিয়ে কখনও উঁচু হয়ে এগুতে লাগলো ফরহাদ ও তার সৈন্যবাহিনী।

বুদ্ধিমান ফরহাদ অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে শত্রুপক্ষের সৈন্য বাহিনীকে একত্রিত করে ঘিরে ফেলল। কতক পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো কতক আত্মসমর্পণ করল ফরহাদের কাছে।

এতোবড় একটা পরাজয়ের কালিমা মুখে মেখে শত্রুপক্ষ আরও ক্ষেপে উঠল। নতুনভাবে আক্রমণ চালাবার জন্য পুনরায় প্রস্তুত হতে লাগল তারা।

সাফল্যের বিজয়মাল্য গলায় পরে ফরহাদ যখন ফিরে গেল ঘাটিতে তখন সেনাপতি নাসের আলী, মেজর জেনারেল হাশেম খান এবং অন্যান্য সামরিক সেনানায়ক ফরহাদের সঙ্গে বুকে বুক মিলালেন। এতোবড় একটা বিজয় তাঁরা যেন আজ আশাই করতে পারেন নি।

আজ প্রায় এক সপ্তাহ কাল অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে এসেছে ফরহাদ। তাই দু'দিনের জন্য তাকে বিশ্রামের নির্দেশ দেওয়া হল।

ওদিকে জব্বার খাঁ কোথায় যে ডুব মেরেছে, আর তাকে খুঁজে পাচ্ছে না ফরহাদ। তবে কি সে নিহত হয়েছে? নিজের তাঁবুতে শুয়ে ভাবছে এসব কথা। এমন সময় জব্বার খাঁ তার তাঁবুতে এসে হাজির। সেলুট ঠুকে সোজা হয়ে দাঁড়ালো স্যার আমি এসেছি।

ফরহাদ ওকে দেখেই উঠে বললো কি খবর জব্বার খাঁ? কোথায় ডুব মেরেছিলে?

জব্বার কণ্ঠস্বর নিচু করে নিয়ে বললো—স্যার শত্রু পক্ষের আহত সৈন্যদের ছদ্মবেশে ডুব মেরে একেবারে ওদের শিবিরে গিয়ে পৌঁছেছিলুম।

ফরহাদ এক লাফে উঠে দাঁড়ায় —তারপর?

তারপর গোপনে ওদের পেটের খবর জেনে এসেছি। স্যার, আমাদের আর এক মুহূর্ত বিশ্রামের সময় নেই এবার জঙ্গী বোমারু বিমান নিয়ে আক্রমণ চালাবে। আজ শেষ রাত্রের দিকে আক্রমণটা চালাবে জানতে পেরেছি।

ফরহাদের বিশ্রাম শেষ হয়ে গেল। নতুন এক উন্মাদনায় চোখ দুটো তার জ্বলজ্বল করে উঠল। কালবিলম্ব না করে নিজের সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিল ফরহাদ।

ঘাটির আশেপাশে কামান আর মেশিনগান বসিয়ে যে যার জায়গায় প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল প্রত্যেকেই রাইফেল হস্তে গোপন স্থানে লুকিয়ে রইল।

ফরহাদ আজ নতুন রূপ ধারণ করেছে। চোখ দিয়ে তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। ললাটে গভীর চিন্তারেখা ফুটে উঠেছে। জব্বার খাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল ফিস ফিস করে কি সব আলোচনা হলো দু'জনার মধ্যে।

জব্বার খাঁর মুখমণ্ডল বিষণ্ন হলো। দু'চোখ তার অশ্রু ছলছল হয়ে উঠলো।

ফরহাদ জব্বার খাঁর পিঠ চাপড়ে কি যেন বলল। তারপর বেরিয়ে গেল। ঘাটির গোপনকক্ষে বসে ওয়্যারলেসে সেনাপতি নাসেরের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ হল তার।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জঙ্গী বোমারু বিমানগুলোও তৈরি হয়ে নিল। একটি বোমারু বিমানের ড্রাইভ আসনে গিয়ে বসলো ফরহাদ। শরীরে তার জঙ্গী বোমারু বিমানের পাইলটের ড্রেস।

ফরহাদের সৈন্যবাহিনী প্রতিমুহূর্তে শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে লাগল। প্রাণ দিয়ে তারা লড়াই করবে। শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করার জন্য তারা প্রতিমুহূর্তে প্রস্তুত আছে। মেজর মাসুদ আর জব্বার খাঁ আজ গোলন্দাজ সৈন্য পরিচালনা করবেন।

গভীর অন্ধকারে গোটা বিশ্ব অন্ধকার। ঘাটির আশেপাশে পরিখার মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে রাইফেলধারী সৈন্যবাহিনী। শত্রুপক্ষের আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে আছে তারা। কামানের পাশে, মেশিনগানের ধারে, যে যার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত। মৃত্যুকে তারা যেন উপহাস করে চলেছে।

হঠাৎ নিস্তব্ধ ধরণী প্রকম্পিত করে বেজে উঠলো বিপদ সংকেত ধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বিমানের শব্দ।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। মিত্রপক্ষের জঙ্গী বিমানগুলো উল্কা বেগে আকাশপথে উড়ে উঠল। একসঙ্গে জঙ্গী বিমান গুলো ধাওয়া করলো শত্রুপক্ষের জঙ্গী বোমারু বিমানগুলোকে।

মিত্রপক্ষের বিমানের চেয়ে তিনগুণ বেশি ছিল শত্রুপক্ষের বোমারু বিমান। তুমুল আকাশযুদ্ধ শুরু হল। দক্ষ পাইলটের মত কাজ করে চলল ফরহাদ।

বিমান ধ্বংসী কামান আর মেশিনগানের শব্দে আকাশ বাতাস কম্পিত হয়ে উঠল। কামানের গোলার আঘাতে শত্রুপক্ষের কয়েকটি বিমানে আগুন ধরে গেল। ঘূর্ণীয়মান অগ্নিকুণ্ডের মত আকাশের বুকে জ্বলে উঠল; পরক্ষণেই বিধ্বস্ত হয়ে ভূপাতিত হল।

ফরহাদ প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে শত্রুপক্ষের বিমানগুলো ধ্বংস করে চলল।

প্রায় ঘন্টা দুই আকাশযুদ্ধ চলার পর শত্রু জঙ্গী বিমানগুলো পরাজয় বরণ করে পিছন দিকে ফিরে চলল। বেশ কয়েকখানা ধ্বংস হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই।

মিত্রপক্ষের দু'খানা বিমানও নষ্ট হল।

যখন জানতে পারলো জব্বার খাঁ রণভূমিতে দাঁড়িয়ে আতঙ্কে মন তার দুলে উঠলো। ফরহাদের বিমানখানা তো বিধ্বস্ত হয়ে যায় নি?

কিন্তু বোনের আশংকা বৃথা। শত্রু বিমানগুলোকে পরাজিত করে সাফল্যের জয়টিকা ললাটে পরে ফিরে এলো ফরহাদ তার জঙ্গী বোমারু বিমান নিয়ে। শুধু শত্রুপক্ষকে পরাজিত করেই ক্ষান্ত হয় নি ফরহাদ। শত্রুপক্ষের একটি ঘাটিও তারা বিধ্বস্ত করে দিয়ে এসেছে।

ফরহাদের প্লেনখানা ফিরে আসতেই সেনাপতি নাসের আলী, মেজর জেনারেল হাশেম খান এবং আরও অন্যান্য সেনানায়ক ফরহাদকে অভিনন্দন জানালেন। সেনাপতি নাসের আনন্দে আত্মহারা হয়ে ফরহাদের সঙ্গে বুকে বুক মিলালেন।

প্রেসিডেন্ট ফরহাদকে খেতাব দান করলেন। সেদিন সবচেয়ে বেশি খুশি হলো জব্বার খাঁ। নিজে হাতে হাত মিলালো তার সঙ্গে।

❑

দেশ যখন মহাসঙ্কটময় অবস্থায় উপনীত হয়েছে, যুদ্ধ নিয়ে সবাই দিশেহারা এমন সময় মুরাদ নাথুরামের সাহায্য যথেচ্ছাচারণে প্রবৃত্ত হল-কোথাও লুটতরাজ, কোথাও বা নারী হরণ কোথাও বা খুনাখারাবি। পুলিশ মহল এই যুদ্ধ ব্যাপারে ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, তারপর রোজই এখানে সেখানে রাহাজানি, লুটতরাজ, নারী হরণের সংবাদ লেগেই আছে। পুলিশ মহলের দৃঢ় বিশ্বাস-এসব বনহুরের কাজ। পুলিশ সুপারের গুলী খেয়ে সে ক্ষেপে উঠেছে।

চারদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেও কিছু হচ্ছে না। শয়তান নাথুরাম আর মুরাদ ঠিকভাবে কাজ করে চলেছে। এতো করেও মুরাদের শান্তি নেই। মনিরার উপর তার কু দৃষ্টি রয়েছে। কেমন করে তাকে পাবে এ চিন্তায় অস্থির সে।

একদিন গভীর রাতে মনিরার দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। মনিরা তখনও ঘুমোতে পারেনি। বার বার বনহুরের বিদায়ক্ষণের কথাগুলো স্মরণ হচ্ছিল। নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিল সে।

হঠাৎ দরজায় মৃদু শব্দ। মনিরার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠল। নিশ্চয়ই সে এসেছে। বলেছিল বনহুর, সুযোগ পেলেই এসে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাব। মনিরা মুহূর্ত বিলম্ব না করে দরজা খুলে দিল। সে ভাবতেও পারেনি, তার জন্য অন্য কোন বিপদ প্রতীক্ষা করতে পারে।

মনিরা দরজা খুলতেই কক্ষে প্রবেশ করলো ভীষণ আকার দু'টি লোক। লোক দুটি মনিরাকে একটি টু শব্দ করতে না দিয়েই মুখে রুমাল চাপা দিল। শুধুমাত্র একটু মিষ্টি গন্ধ, তারপর আর কিছু মনে নেই মনিরার।

মনিরার সংজ্ঞাহীন দেহটা একটা কালো কাপড়ে ঢেকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে নিচে নেমে এলো লোক দুটি। সদর দরজার পাশে দারওয়ান ঠেস দিয়ে আছে, তার বুকে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে

একখানা সুতীক্ষ্ণধার ছোরা। তাজা রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার সাদা ধবধবে পোশাকটা।

গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে একখানা কালো রং-এর মোটর গাড়ি অন্ধকারে মিশে রয়েছে লোক দুটি মনিরাকে নিয়ে গাড়িখানায় উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছুটতে শুরু করল জনহীন রাজপথ বেয়ে ছোট্ট কালো রং এর গাড়িখানা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। আকাশে অসংখ্য তারার মালা। গোটা শহরটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে দু'একটি মোটর এদিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে।

বড় রাস্তা ছেড়ে একটি নির্জন অন্ধকার গলিপথে প্রবেশ করলো গাড়িখানা। আঁকাবাঁকা পথে ঘন্টাখানেক চলার পর একটি পুরানো বাড়ির সম্মুখে গাড়িখানা থেমে পড়লো।

লোক দুটি এবার মনিরার জ্ঞানহীন দেহটা নামিয়ে নিয়ে সেই পুরানো বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করলো। কয়েকটি ভাঙ্গা চুরো ঘর এবং বারান্দা পেরিয়ে একটি সিঁড়ি আছে; সেই সিঁড়ি বেয়ে চললো তারা। তারপর উপরে বড় বড় কয়েকখানা অর্ধ ভগ্ন ঘর। ওদিকে একটি মস্তবড় ঘরের মধ্যে নীলাভ ধরনের আলো জ্বলছে। মেঝেতে দামী কার্পেট বিছানো। মাঝখানে একটি টেবিলের পাশাপাশি কয়েকখানা চেয়ার। আর তেমন কোন আসবাবপত্র নেই সে কক্ষে। টেবিলে কয়েকটা মদের বোতল আর কাঁচের গেলাস বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো। কক্ষমধ্যে একটি চেয়ারে বসে রয়েছে মুরাদ। মদের নেশায় চোখ দু'টো ওর ঢুলু ঢুলু।

মনিরাকে নিয়ে লোক দুটি যখন মুরাদের সম্মুখে রাখলো তখন মনিরার সংজ্ঞা ফিরে আসছে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো মনিরা। সব যেন কেমন এলোমেলো ঝাপসা লাগছে। কিছুক্ষণ হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইল সে।

মুরাদ ইঙ্গিত করলো লোক দুটিকে বেরিয়ে যেতে।

লোক দুটি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

মুরাদ টলতে টলতে এগিয়ে এলো মনিরার পাশে। মনিরার মাথার চুলে হাত রেখে মৃদু টান দিল।

মনিরা মুখ তুলে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার মতই চমকে উঠল। চিৎকার করে বললো—মুরাদ!

অট্টহাসি হেসে উঠলো মুরাদ—হ্যাঁ, আমি-আমি তোমার ভাবী স্বামী....

মনিরা তখন কম্পিত পদে উঠে দাঁড়িয়েছে। মুরাদ ওকে ধরতে যায়।

মনিরার তখন মাথাটা ঝিমঝিম করছে। চট করে সরে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যায়।

মুরাদ তার দিকে এগুতেই পুনরায় উঠে দাঁড়ায় মনিরা।

নিঃশ্বাস দ্রুত বইছে। দাঁতে অধর দংশন করে বলে—শয়তান, তুমি আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছ?

হেসে উঠে মুরাদ—এখনও বুঝতে পারনি? তোমার জন্যই আমার এ সংগ্রাম। হাজার হাজার টাকা আমি পানির মত খরচ করে চলেছি...

মনিরার চোখ দিয়ে তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। ললাটে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

মুরাদ বলে চলেছে—কিন্তু তোমাকে পাইনি। দস্যু বনহুর সব সাধ, সব আশা বিনষ্ট করে দিয়েছে... হাঃ হাঃ হাঃ, আজ কোথায় তোমার সেই প্রিয়তম

মনিরা চোখে সর্ষে ফুল দেখে—এখন তার উপায়! এ পাপিষ্ঠের হাত থেকে কি করে সে পরিত্রাণ পাবে? নিরুপায়ের মত কক্ষের চারদিকে তাকায়। কণ্ঠনালী তার শুকিয়ে আসছে। বার বার জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দু'খানা ভিজিয়ে নেয় মনিরা।

মুরাদ এগিয়ে আসছে, চোখে লালসাপূর্ণ লোলুপ দৃষ্টি। মুখে কুৎসিত হাসি, দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসছে সে—মনিরা তোমাকে নিয়ে আমি আকাশ কুসুম গল্প রচনা করেছিলুম। সে আকাশ কুসুম স্বপ্ন আমার ধূলোয় মিশে যেতে বসেছে। আজ আমি তোমাকে পেয়েছি...না না, আর আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়ছি না। দস্যু বনহুরও আজ তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না... মনিরাকে ধরতে যায় মুরাদ।

মনিরা ক্ষিপ্তের ন্যায় একখানা চেয়ার তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারে মুরাদের শরীর লক্ষ্য করে।

মুরাদ হাত দিয়ে অতি সহজেই চেয়ারখানা ধরে ফেলে হেসে উঠে—হাঃ হাঃ হাঃ তুমি আমাকে কাবু করবে। এসো, এসো বলছি আমার বাহুবন্ধনে...

মনিরা একটা মদের বোতল তুলে ছুঁড়ে মারে।

মুরাদ মুহূর্তে সরে দাঁড়ায়। বোতলটা ওপাশের দেয়ালে লেগে সশব্দে ভেঙে যায়।

হঠাৎ মনিরার চোখে পড়ে-টেবিলের এক পাশে একটি ছোরা পড়ে রয়েছে। কালবিলম্ব না করে টেবিল থেকে ছোরাখানা হাতে তুলে নেয় মনিরা।

ঠিক সেই মুহূর্তে মুরাদ জড়িয়ে ধরে মনিরাকে। মনিরা সঙ্গে সঙ্গে হস্তস্থিত ছোরাখানা বসিয়ে দেয় মুরাদের বুকে।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে ভূতলে পড়ে যায় মুরাদ। ভাগ্যিস ছোরাখানা মুরাদের বক্ষ ভেদ করে যায় নি। বাম পার্শ্বের কিছুটা মাংস ভেদ করে গেঁথে গিয়েছিল ছোরা খানা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করে একজন লোক। মনিরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটাকে দেখামাত্র চিনতে ভুল হয় না তার সেই নৌকার মাঝি ছিল লোকটা। বনহুরের মুখে শুনেছিল লোকটা নাকি শয়তান ডাকু নাথুরাম। ভয়ে শিউরে উঠে মনিরা না জানি তার অদৃষ্টে আজ কি আছে!

লোকটা হাতে তালি দিল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন ভীষণ আকার লোক কক্ষে প্রবেশ করল। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুরাদকে নিয়ে।

মনিরা দেখলো দরজা মুক্ত যেমনি সে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে অমনি একজন ধরে ফেলল তাকে। লোকটার বলিষ্ঠ হাতের চাপে মনিরার হাতখানা যেন পিষে যাচ্ছিল। লোকটা বলল সর্দার একে কি করব?

কর্কশ কঠিন কণ্ঠে বলে উঠে শয়তান নাথুরাম—সেই অন্ধকার ঘরটায় বন্দী করে রাখ। দেখিস যেন না পালায়।

লোকটা মনিরাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

পিছনে শোনা যায় মরাদের আর্তকণ্ঠ—উঃ আঃ..

ভোরে মনিরার কক্ষে প্রবেশ করে মরিয়ম বেগম আশ্চর্য হন। মনিরা এতো সকাল সকাল তো কোনদিন উঠে না।

তাছাড়া গেলেই বা কোথায়। মরিয়ম বেগম ভাবলেন সে হয়তো বাথরুমে গেছে। তাই নিজের ঘরে ফিরে গেলেন মরিয়ম বেগম। স্বামীকে অজুর পানি দিয়ে নিজেও নামাজ পড়ে পুনরায় ফিরে এলেন মনিরার কক্ষে। কিন্তু একি এখনও মনিরা ঘরে আসেনি! মরিয়ম বেগমের মনটা কেমন যেন করে উঠলো। তিনি কক্ষের চারদিকে তাকালেন। কক্ষের জিনিসপত্র ঠিক আছে-এমনকি মনিরার বিছানাটাও এলোমেলো নয়। জানালাগুলোও ঠিক আঁটা। মনিরা যতক্ষণ দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েছে। মরিয়ম বেগম চিন্তিতভাবে ছুটলেন চৌধুরী সাহেবের কক্ষে। ওগো শুনছো ঘরে মনিরা নেই।

চৌধুরী সাহেব নামাযান্তে তসবী তেলাওয়াত করছিলেন, আশ্চর্য কণ্ঠে বললেন সেকি কথা।

হাঁ, আমি বাড়ির সব জায়গা খুঁজে দেখলুম, কোথাও সে নেই।

বাইরে কোথাও যায়নি তো?

না, এতো ভোরে সে কোনদিন ঘুম থেকেই উঠে না, আর আজ সে কাউকে কিছু না বলে বাইরে যাবে। ওগো, একি কাণ্ড?

আচ্ছা দাঁড়াও ড্রাইভারকে ডাকি। দেখি বাইরে গেছে কিনা।

এমন সময় বয় ছুটে আসে হাউ মাউ করে কাঁদতে সে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—স্যার খুন খুন।

একসঙ্গে বলে উঠেন চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম—খুন কে খুন হয়েছে?

বয় কাঁপতে কাঁপতে বলে—দারওয়ান-দারওয়ান খুন হয়েছে!

চৌধুরী সাহেব বলে উঠে—কি বলছিস তুই?

হাঁ স্যার, সব সত্যি বলছি। দেখবেন আসুন, দরজার পাশে দারওয়ান মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

মিঃ চৌধুরী এবং মরিয়ম বেগম ছুটলেন সিঁড়ি বেয়ে নিচে।

সদর দরজার নিকটে পৌঁছে স্তম্ভিত হতবাক হলেন। বহু দিনের পুরানো দারওয়ান মংলু মিয়ার রক্তাক্ত দেহটা ভূতলে লুটিয়ে আছে। চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগমের দু'চোখ ছাপিয়ে পানি এলো; রুমালে চোখ মুছলেন চৌধুরী সাহেব।

অল্পক্ষণেই লোকজনে বাড়ি ভরে গেল।

মনিরার অন্তর্ধান ব্যাপারের সঙ্গে এ খুন রহস্য নিশ্চয়ই জড়িত আছে। চৌধুরী সাহেব পুলিশ অফিসে ফোন করলেন। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত এবং ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মনিরার নিরুদ্দেশ তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। কারণ, এটা চৌধুরী বাড়ির ইজ্জত নিয়ে ব্যাপার!

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিঃ হারুন কয়েকজন পুলিশসহ চৌধুরী বাড়িতে হাজির হলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে মিঃ হারুন মৃদু হাসলেন; ভাবলেন, এ দস্যু বনহুরের কাজ ছাড়া আর কারো নয়। তিনি প্রকাশ্যে বলেন-চৌধুরী সাহেব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কারণ, মনিরা এখন আপনার পুত্রের পাশেই রয়েছে।

মুহূর্তে চৌধুরী সাহেবের মুখমণ্ডল রাঙা হয়ে উঠে, তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বলেন–আপনি কি বলতে চান মনির দারওয়ানকে খুন করে মনিরাকে নিয়ে পালিয়েছে?

হ্যাঁ মিঃ চৌধুরী, এ কথা নির্ঘাত সত্য। আপনার পুত্র ছাড়া এ কাজ কেউ করতে পারে না।

মিথ্যা সন্দেহ করছেন ইন্সপেক্টর সাহেব। আমার মনির কখনও নরহত্যা করতে পারে না। তাছাড়া মনিরাকে নিয়ে তার পালাবার কোন প্রয়োজনই নেই।

মিঃ হারুন বলেন–চৌধুরী সাহেব, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আপনার ভাগনী মনিরা আপনার পুত্রকে ভালবাসে।

সেই কারণেই দারওয়ানকে খুন করার কোন দরকার ছিল না তার।

মিঃ হারুন এবং চৌধুরী সাহেব কথাবার্তা বলছেন, এমন সময় ডিটেকটিভ মিঃ শঙ্কর রাও এসে হাজির হলেন। তিনি পুলিশ অফিসে এসে ঘটনাটা জানতে পেরে থাকতে পারেন নি, সোজা চলে এসেছেন চৌধুরী বাড়িতে।

তিনিও ঘটনাটা বিস্তারিত শুনলেন। মিঃ রাও বলেন–চলুন, মনিরার কক্ষটি একবার পরীক্ষা করে দেখব।

চৌধুরী সাহেব বলেন...কক্ষের একটি জিনিসপত্র এলোমেলো হয় নি বা কোন কিছুর চিহ্ন নেই...

উঠে দাঁড়ান মিঃ রাও–চলুন, তবু একবার দেখা দরকার।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে চললেন মিঃ হারুন, মিঃ রাও এবং চৌধুরী সাহেব।

উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ রাও—উপরে উঠবার সিঁড়ি কি এই একটি?

জবাব দিলেন চৌধুরী সাহেব—হাঁ, এই একটি সিঁড়িই রয়েছে।

তাহলে এই সিঁড়ি দিয়েই নেমে গেছে মনিরা এবং যে তাকে নিয়ে গেছে সে।

হ্যাঁ, তাই হবে। নীরস কণ্ঠস্বর চৌধুরী সাহেবের।

মিঃ রাও সকলের অলক্ষ্যে সিঁড়ির প্রত্যেকটা ধাপে লক্ষ্য রেখে এগুচ্ছিলেন। হঠাৎ তার নজরে পড়ে যায় সিঁড়ির এক পাশে একটি লেডিস স্যান্ডেল কাৎ হয়ে পড়ে আছে। মিঃ রাও স্যান্ডেলখানা হাতে উঠিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এটা কার?

চৌধুরী সাহেব জুতোখানা লক্ষ্য করে বলেন–মনিরার। কিন্তু একখানা জুতো এখানে এল কি করে?

তাইতো?

কথার ফাঁকে তারা উপরে এসে পৌছে গেছেন। তখনও মনিরার স্যান্ডেলখানা মিঃ রাও-এর হাতে ধরা রয়েছে।

মিঃ রাও স্যান্ডেলখানা বারান্দার একপাশে রেখে বলেন—মনিরা স্বইচ্ছায় কারো সঙ্গে যায় নি। তাকে কেউ বা কারা জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গেছে।

মিঃ হারুন বলে উঠেন—দস্যু বনহুর ছাড়া তাহলে এ কাজ কে করতে পারে?

গোটা কক্ষটা তাঁরা সুন্দরভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন। কক্ষের একটি জিনিসও স্থানচ্যুত হয় নি। দরজা মনিরা যে স্বহস্তে খুলেছে তার প্রমাণ রয়েছে। কারণ, দরজার খিল ভাঙ্গেনি বা কোনরকম আগলা হয় নি।

ক্রমেই ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠছে।

দস্যু বনহুরকে মনিরা ভালবাসে–এ কথা সবাই জানে।

মনিরাকে চুরি করে নিয়ে যাবার তার কোন প্রয়োজন হবে না, মনিরা ইচ্ছা করেই যেতে

পারতো। দারওয়ানকে খুন করবার কোন দরকারই নেই তাদের। তাছাড়া সিঁড়ির ধাপে মনিরা একটি স্যান্ডেলই বা পড়ে থাকবে কেন?

আরও একটি প্রমাণ তাঁরা পেলেন। বারান্দার মেঝেতে লক্ষ্য করে দেখল, কয়েকটি পায়ের ছাপ বেশ স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। আরও দেখলেন তারা, পায়ের ছাপগুলো খালি পা এবং থেবড়ো থেবড়ো পাগুলো।

মিঃ হারুন পায়ের ছাপগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য করে বললেন—দস্যু বনহুর যেখানেই হানা দিয়েছে, আমরা লক্ষ্য করেছি, কখনও তার খালি পা ছিল না।

মিঃ রাও বলেন–এ নিশ্চয়ই অন্য কোন শয়তানের কাজ। দস্যু বনহুর মনিরাকে নিয়ে যায় নি–এ সত্য।

চৌধুরী সাহেব মাথায় হাত দিয়ে একটি সোফায় বসে পড়লেন–তাহলে উপায়?

❏

বার বার যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে শত্রুপক্ষ পিছু হটে গেল। পুনরায় আক্রমণের চেষ্টা তাদের মন থেকে কর্পূরের মত উবে গেল। ফরহাদের পরিচালনায় বিমানবাহিনী শত্রুপক্ষকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জয়ী হল মিত্রপক্ষ। পরাজয়ের কালিমা মুখে মেখে হটে পড়ল শত্রুপক্ষ। সেনাপতি নাসের আলীর আনন্দ আর ধরে না! শুধু তিনিই নন, সমস্ত সামরিক অফিসারদের মুখমণ্ডল জয়ের উল্লাসে দীপ্ত হয়ে উঠলো। সবাই একবাক্যে ক্যাপ্টেন ফরহাদের রণকৌশলের প্রশংসা করতে লাগলেন।

কিন্তু এক আশ্চর্য ব্যাপার–সবাই যখন ক্যাপ্টেন ফরহাদের গুণগান করেছেন, তখন দেখা গেল ফরহাদ আর তাদের মধ্যে নেই! আর নেই জব্বার খাঁ।

এ ব্যাপার নিয়ে দেশময় একটা হুলস্থূল পড়ে গেল। সেনাপতি নাসের এবং মেজর জেনারেল হাশেম খান ও অন্যান্য সামরিক অফিসার গভীর চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

পত্রিকায় পত্রিকায় যখন ক্যাপ্টেন ফরহাদের জয়গান প্রচারিত হচ্ছে, এমন দিনে শোনা গেল ফরহাদের নিরুদ্দেশের কথা।

কথাটা জানতে পেরে দেশবাসী গভীর শোকাভিভূত হয়ে পড়ল। সকলের মুখমণ্ডল বিষণ্ণ মলিন হলো। নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষ তাঁকে গোপনে চুরি করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে।

দেশবাসী যখন ক্যাপ্টেন ফরহাদের নিরুদ্দেশ ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত, এমন দিনে মেজর জেনারেল একখানা চিঠি পেলেন। চিঠিখানা পড়ে তিনি স্তম্ভিত-হতবাক হয়ে পড়লেন। চিঠিতে লেখা রয়েছে মাত্র একটি কথা–

"মাতৃভূমি রক্ষার্থে আমাদের প্রচেষ্টা
সার্থক হয়েছে। এজন্য আমরা
ধন্য। আপনাদের অভিনন্দন আমি সানন্দে গ্রহণ করেছি।

–দস্যু বনহুর
(ক্যাপ্টেন ফরহাদ)

চিঠির কথা অল্পক্ষণের মধ্যেই ফোনে সমস্ত সামরিক অফিসে পৌঁছে গেল। পৌঁছল পুলিশ অফিসের প্রত্যেকটা অফিসারের কানে। সবাই নির্বাক, বিস্ময়ে স্তম্ভিত–এ যে কল্পনার অতীত"! যে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য অহরহ পুলিশ বাহিনী উন্মাদের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ সুপার যাকে জীবিত কিংবা মৃত এনে দেবার জন্য লাখ টাকা ঘোষণা করেছেন, সেই দস্যু বনহুর আজ সকলের অভিনন্দন গ্রহণের পাত্র।

কথাটা পত্রিকায় বিরাট আকারে প্রকাশ পেল।

লোকের মুখে মুখে, পথে-ঘাটে-মাঠে সর্বত্র দস্যু বনহুরের জয়-জয়কার!

নূরী গহন বনে বসে শুনলো সব। আনন্দে স্ফীত হয়ে উঠলো তার বুক। তার বনহুর আজ জয়ের টিকা ললাটে পরে ফিরে এসেছে। কি বলে যে সে অভিনন্দন জানাবে খুঁজে পেল না। মনের আনন্দে গুন গুন করে গান গাইতে লাগলো সে। ইচ্ছে হল, হাওয়ায় ডানা মেলে ভেসে বেড়ায়–কিন্তু সে যে মানুষ! বনে বনে ঘুরে অনেক ফুল সংগ্রহ করলো, ঝর্ণার পাশে বসে সুন্দর করে মালা গাঁথলো। তারপর পা টিপে টিপে প্রবেশ করলো বনহুরের বিশ্রামকক্ষে। অতি সন্তর্পণে বনহুরের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

বনহুর বিছানায় অর্ধশায়িত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে কি যেন ভাবছিল। শরীর ক্লান্ত, তাই কোথাও বের হয়নি সে। নূরী ঠিক তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর চট করে মালাখানা পরিয়ে দিল সে ওর গলায়।

বনহুর মৃদু হেসে বললো—খুব যে খুশি দেখছি, ব্যাপার কি নূরী?

নূরী হেসে বললো—হুর, আজ কি বলে তোমাকে.....

থাক, ঐ ঢের হয়েছে। বস।

নূরী বনহুরের বিছানার একপাশে বসে পড়ে বলল—হুর, আজ তোমার জয়গানে দেশবাসী পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে।

কে বলল এসব কথা তোমাকে?

কেন, রহমান—রহমান সব পত্রিকাগুলো আমাকে এনে দিয়েছে।

তুমি পত্রিকা পড়তে শিখেছ?

বাঃ তোমার বুঝি মনে নেই? তুমিই তো আমাকে লেখা আর পড়া শিখিয়েছ?

এতোবড় যে পণ্ডিত হয়েছ তা জানতাম না।

পত্রিকা পড়তে পারলেই বুঝি পণ্ডিত হয়? অভিমান-ভরা কণ্ঠস্বর নূরীর।

বনহুর ওর চিবুক উঁচু করে ধরে—ছিঃ, সামান্যতেই অমন রাগ করতে নেই। নূরী, ধরো আর যদি ফিরে না আসতুম?

নূরী বনহুরের মুখে হাতচাপা দেয়।

বনহুর কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় রহমান দরজার ওপাশে এসে দাঁড়ায়—সর্দার!

বনহুর গলা থেকে মালাটা খুলে পাশের টেবিলে রেখে বিছানায় সোজা হয়ে বসে বলে—এসো।

রহমান এসে দাঁড়াতেই নূরী হেসে বলে—রহমান নয়, জব্বার খাঁ।

সবাই হাসলো।

রহমান বলল—সর্দার, একটি কথা আছে।

বনহুর বিছানা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বলল–চলো।

বাইরে আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালো বনহুর আর রহমান। বনহুর জিজ্ঞাসা করলো–কি কথা রহমান?

সর্দার সেই মেয়েটি...থেমে যায় রহমান।

বনহুর ভ্রু কুঁচকে তাকায় রহমানের মুখের দিকে—কোন মেয়েটি? কি ব্যাপার?

সর্দার, সেই যে মনসাপুরের জমিদার-কন্যা সুভাষিণীর কথা বলছি।

কেন, হসপিটাল থেকে সে বাড়ি ফিরে যায় নি?

গিয়েছে—কিন্তু....

থামলে কেন, বল?

মেয়েটি যদি পাগল হয়ে গেছে?

বল কি? মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে? কিন্তু কেন?

রহমান একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলে—সুভাষিণী এমন একজনকে ভালবাসছে, যাকে—যাকে সে কোনদিন পাবে না।

বনহুরের অজ্ঞাতে নূরী একটি গাছের আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিল। গোপনে সে রহমান আর বনহুরের কথাবার্তা সব শুনছিল। সুভাষিণীর নাম তার পরিচিত। গোপনে তার বিষয়ে আলোচনা শুনেই চমকে উঠেছিল সে। এখন কিছুটা ঘেমে উঠে। না জানি কাকে ভালবেসেছে। আশঙ্কা জাগে মনে—তার হুরকে নয়তো। আরো ভালোভাবে কান পাতে নূরী।

বনহুরের কণ্ঠস্বর শোনা যায়—এটাই তোমার গোপন কথা?

হাঁ সর্দার, মেয়েটির যা অবস্থা, তাতে সে বেশিদিন বাঁচবে বলে মনে হয় না। যদি সে... পুনরায় থেমে যায় রহমান।

বনহুর গম্ভীর গলায় বলে—থামলে কেন?

মাথা চুলকে বলে রহমান—মানে তার ভালোবাসার পাত্রটিকে যদি না পায়, তাহলে....

বাঁচবে না—এ তো বলতে চাচ্ছো?

হ্যাঁ সর্দার।

কে সে যুবক যাকে ভালবাসে? সুভাষিণীর মত সুন্দরী গুণবতী যুবতীকে যে উপেক্ষা করতে পারে? বল, আমি তাকে উচিত সাজা দেব।

রহমান নীরব।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সর্দার, আপনি যদি একবার তার সঙ্গে দেখা করতেন, তাহলে হয়তো কাকে সে ভালবাসে, জানতে পারতেন।

সে এখন কোথায়?

মনসাপুরে। পিতামাতার কাছে।

বেশ, আমি তার সঙ্গে দেখা করব—তুমি তার আয়োজন কর। আমি জানতে চাই কাকে সে ভালবাসে।

তাকে এনে দিতে পারবেন সর্দার?

দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই রহমান। ছলে-বলে-কৌশলে তাকে রাজি করাব। যত টাকা চায় তাই দেব। তবু যদি স্বীকার না হয়, বন্দী করে নিয়ে আসব। সামান্য ভালবাসার জন্য একটি সুন্দর ফুলের মত জীবন বিনষ্ট হতে পারে না।

মারহাবা সর্দার! তারপর রহমান চলে যায় সেখান হতে।

বনহুর ধীর মন্থর গতিতে ফিরে আসে নিজের কক্ষে।

ইতোমধ্যে নূরী এসে নিজ জায়গায় বসে পড়েছিল।

বনহুর এসে পুনরায় বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে।

নূরী গম্ভীর মুখে বলেছিল, বলো—হুর, আজও তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না।
কেন?
ঐ যে গোপনে কি সব আলোচনা কর?
সব কথা তোমার শোনা উচিত নয় নূরী।
কেন, আমি কি সব বুঝি না?
এসব চুরি-ডাকাতির ব্যাপার কি শুনবে....

মিথ্যে কথা! রহমান কোন মেয়ে সম্বন্ধে তোমাকে কি সব বলছিল না? ওঃ সেই কথা? হ্যাঁ, ঐ যে মনসাপুরের জমিদার-কন্যা মুক্তামণীর সম্বন্ধে বলল রহমান। মেয়েটি নাকি পাগল হয়ে গেছে।

আমি সব শুনেছি।

দেখ, মেয়েটিকে বাঁচাতে হলে আমাকে একবার সেখানে যেতে হবে। জানতে হবে কাকে সে ভালবাসে। যেমন করে হোক, তার ভালবাসার পাত্রটিকে এনে দিতে হবে.....

সব কাজেই তোমার মাথাব্যথা। আমি বুঝতে পারি না এসব।

সে জন্যই তো বলেছিলুম সব কথা তুমি জানতে চেও না নূরী।

নূরী আর কোন কথা না বাড়িয়ে তখনকার মত চলে যায় সেখান হতে।

বনহুর এবার পাশ ফিরে শোয়, কিন্তু মনে তখন একটি অতি পরিচিত মুখ ভেসে উঠছে। যুদ্ধ থেকে ফিরে কয়েক দিন বেশ অসুস্থ বোধ করেছিল সে। মনিরা নিশ্চয়ই অভিমান করে বসে আছে। যেমন ভাবা অমনি বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল! উঃ কতদিন মনিরাকে দেখেনি! চটপট তৈরি হয়ে নিল বনহুর। আজ সে দস্যু বনহুরের বেশে নয়, সৈনিকের বেশে সজ্জিত হয়ে তাজের পাশে এসে দাঁড়াল।

তাজ মনিবকে পাশে পেয়ে সম্মুখের পা দিয়ে মাটিতে মৃদু আঘাত করতে লাগল।

বনহুর তাজের পিঠ চাপড়ে আদর করল, তারপর উঠে বসল তার পিঠে।

তাজ এবার উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করল।

❑

তাজের পিঠে বনহুর ছুটে চলেছে। মনে তার রঙিন স্বপ্নের নেশা। কতদিন পর মনিরাকে পাশে পাবে সে। বিদায় দিনে মনিরার অশ্রুসজল মুখখানা ভাসতে লাগলো তার চোখের সম্মুখে।

ঐ দেখা যাচ্ছে চৌধুরী বাড়ির বিরাট প্রাচীর। অন্ধকারের আড়ালে বিরাট প্রাসাদের এক অংশ দেখা যাচ্ছে। আকাশে অসংখ্য তারকারাজি। নীল শাড়ির বুকে যেন জরীর বুটিগুলো ঝিকমিক করছে। অন্ধকার নির্জন পথ।

বনহুরের অশ্ব নিঃশব্দে চৌধুরী বাড়ির পিছন প্রাচীরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বনহুর কালবিলম্ব না করে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে প্রাচীরের উপরে উঠে বসল। হঠাৎ মনটা যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। মনিরার কক্ষ অন্ধকার। জানালা দিয়ে কোনো আলোর ছটা আজ তাকে অভিনন্দন জানাল না। প্রাচীর টপকে ভিতরে প্রবেশ করলো বনহুর। তারপর দ্রুত পাইপ বেয়ে উঠে গেল উপরে। কিন্তু একি! মনিরার কক্ষের প্রত্যেকটা জানালা বন্ধ—তবে কি মনিরা এ কক্ষে থাকে না!

বনহুর রেলিং বেয়ে বেলকুনিতে গিয়ে পৌঁছে। মনিরার দরজার পাশে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়—দরজায় তালা লাগানো। মুহূর্তে বনহুরের মুখমণ্ডল অন্ধকার হয়ে পড়ল। সেকি, মনিরা

তবে গেল কোথায়! নিশ্চয়ই তাহলে মামীমার কক্ষে শুয়েছে। বনহুর পাশের কক্ষের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলো, তবে কি সে ফিরে যাবে? তা হয় না, মনিরাকে না দেখে ফিরে যেতে পারে না সে। কিন্তু কি উপায়ে কক্ষে প্রবেশ করবে সে। দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই। বেলকনি থেকে কক্ষের পিছনের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওপাশের আর একটি কক্ষ থেকে ভেসে আসছে চৌধুরী সাহেবের নাসিকাধ্বনি। বনহুর কতকটা আশ্বস্ত হল। এ কক্ষে তাহলে তার মা আর মনিরা শুয়েছে। কতদিন পর মায়ের কথা স্মরণ হতে দু'চোখে পানি এলো। আজ মা-কেও দেখবে সে।

❑

কক্ষে ডিমলাইট জ্বলছে। বনহুর অল্প চেষ্টাতেই জানালার শার্শী খুলে কক্ষে প্রবেশ করল। ধীরে অতি সন্তর্পণে এগুতে লাগলো—কিন্তু একি! বিছানায় শুধু একটি মহিলাই শুয়ে রয়েছেন। মনিরা কই? তবে কি মনিরা অন্য কোন কক্ষে শুয়েছে? ফিরে যাবার পূর্বে মায়ের মুখখানা দেখার প্রবল বাসনা জাগল তার মনে। প্যান্টের পকেট থেকে ম্যাচটা বের করে একটা কাঠি জ্বালল বনহুর। এগিয়ে গেলো মায়ের মুখের পানে।

হঠাৎ মরিয়ম বেগমের ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোখ মেলেই চিৎকার করতে গেলেন তিনি, অমনি বনহুর তাঁর মুখে হাতচাপা দিয়ে বলল—মা!

মরিয়ম বেগম ততক্ষণে বিছানায় উঠে বসেছেন। চোখ রগড়ে বলেন—কে–কে তুই?

বনহুর নিশ্চুপ, সোজা হয়ে দাঁড়াল সে।

মরিয়ম বেগম শয্যা থেকে নেমে দাঁড়ালেন, হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে বনহুরকে দেখে দু'পা পিছিয়ে গেলেন। বনহুরের শরীরে সম্পূর্ণ সৈনিকের ড্রেস দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

বনহুর বুঝতে পারল, তার মা তাকে চিনতে পারেন নি। আর চিনবেনই বা কি করে। বনহুর মাথার ক্যাপটা খুলে আলোর সম্মুখে এগিয়ে দাঁড়াল। তারপর ধীরস্থির শান্ত কণ্ঠে বলল—মা, আমি তোমার সন্তান।

মরিয়ম বেগম নিষ্পলক আঁখি মেলে তাকালেন বনহুরের উজ্জ্বল-দীপ্ত মুখের দিকে। কই, একে তো মনে পড়ছে না—তার মনির এটা! ফুলের মত সুন্দর একটি মুখ ভেসে উঠলো চোখের সামনে। হঠাৎ মনে পড়ল মনিরের ললাটের এক পাশে কাটা একটি দাগ ছিল। ছোটবেলায় বড় দুষ্টু ছিল মনির—গাছ থেকে পড়ে কপালটা বেশ কেটে গিয়েছিল। মরিয়ম বেগম বনহুরের ললাটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মরিয়ম বেগমের অস্ফুট কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো—বাবা মনির!

বনহুর মায়ের বুকে মুখ গুঁজে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডেকে উঠল,—মা, আমার মা!

কতদিন পর পুত্রকে ফিরে পেয়েছেন মরিয়ম বেগম। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন তিনি, কচি শিশুর মত বনহুরের মুখে-মাথায়-পিঠে হাত বুলাতে থাকেন। চোখ দিয়ে তার ঝরে পড়তে থাকে আনন্দ-অশ্রু। তিনি যেন হারানো রত্ন খুঁজে পেয়েছেন। খুশিতে আত্মহারা হয়ে ডাকতে থাকেন —ওগো, শুনছো, দেখে যাও, দেখে যাও কে এসেছে.....

বনহুর মায়ের মুখে হাতচাপা দিয়ে বলে–মা, চুপ করো। চুপ করো।

ওরে তোর আব্বাকে ডাকছি.....

না মা, আজ নয় মা, আজ নয়। আব্বাকে তুমি আজ ডেকো না। মা, একটি কথার জবাব দাও?

বল, ওরে বল?

মা, মনিরা কই? ওকে তো দেখছিনে

মুহূর্তে মরিয়ম বেগমের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে পড়লো। শুষ্ক কণ্ঠে বলেন—আজ প্রায় দু'সপ্তাহ হল মনিরাকে কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে বাবা।

বনহুরের চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠে—আর তোমরা চুপ করে বসে আছো!

না রে না। পুলিশকে জানানো হয়েছে। জোর খোঁজা-খুঁজি চলছে। তোর আব্বা তো পাগলের মত হয়ে গেছেন। কি হবে বাবা, মনিরাই যে আমাদের চৌধুরী বংশের ইজ্জৎ।

মা, তুমি যতটুকু জান খোলসা বল—কবে, কিভাবে, কোথা থেকে সে চুরি হয়ে গেছে?

বনহুরের কণ্ঠে একরাশ চঞ্চলতা ঝরে পড়ল।

মরিয়ম বেগম সংক্ষেপে সব বললেন।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনলো বনহুর। দু'চোখে তার আগুন ঝরে পড়তে লাগল। নিঃশ্বাস দ্রুত বইছে। বার বার দক্ষিণ হস্তখানা প্যান্টের পকেটে রিভলভারের বাটে গিয়ে ঠেকছে। অধর দংশন করতে লাগলো বনহুর। সমস্ত মুখমণ্ডল তার কঠিন হয়ে উঠেছে।

মরিয়ম বেগম পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন।

বনহুর আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে মায়ের পায়ে সালাম করে উঠে দাঁড়াল।

মরিয়ম বেগমের চোখ দিয়ে তখন অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

বনহুর ক্যাপটা মাথায় দিয়ে একবার ফিরে তাকালো মায়ের মুখে।

মরিয়ম বেগম কিছু বলতে গেলেন, কিন্তু ততক্ষণে মুক্ত জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেছে বনহুর।

মরিয়ম বেগম ছুটে গেলেন জানালার পাশে। অস্ফুট কণ্ঠে ডাকলেন—মনির!

মনির ততক্ষণে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বনহুর যখন তাজের পিঠে চেপে বসলো, তখন দমকা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আকাশে তারকারাজিগুলো মেঘের অন্তরালে লুকিয়ে পড়েছে। অন্ধকারে তাজের কালো দেহটা মিশে গেছে যেন।

কিছু পূর্বেই বনহুরের মনে ছিল অফুরন্ত আনন্দ, আশা-বাসনা—মনিরার সঙ্গে সাক্ষাতের এক উদাম প্রেরণা। সব যেন এক নিমিষে অন্তর্ধান হয়ে গেছে। ক্রুদ্ধ সিংহের মত হিংস্র হয়ে উঠল বনহুর। কে সে পিশাচ যে তার মনিরাকে হরণ করতে পারে! এ মুহূর্তে বনহুর তাকে পেলে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলবে।

বনহুরের অশ্ব যখন আস্তানায় গিয়ে পৌঁছল তখন পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে। বনহুর পৌঁছতেই দু'জন বলিষ্ঠ লোক তাজকে ধরে ফেলল। বনহুর সোজা দরবার-কক্ষে প্রবেশ করল। ক্ষিপ্তের ন্যায় চিৎকার করে ডাকলো—রহমান! রহমান!

রহমান দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করে সেলুট করে দাঁড়াল—সর্দার।

এ মুহূর্তে আমার সমস্ত অনুচরগণকে ডেকে বলে দাও—শহরে-গ্রামে, ঘাটে-মাঠে, গহন বনে সমস্ত জায়গায় তাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে। যে যে-কোন ছদ্মবেশে যাবে। সাধু-সন্ন্যাসী, ভিখারী, অন্ধ, নাপিত, ধোপা—যে যা পারে। চৌধুরী সাহেবের মনে মনিরা চুরি হয়ে গেছে, কে বা কারা তাকে হরণ করেছে, কেউ জানে না। পুলিশ জোর তদন্ত চালিয়েও মেয়েটির কোন সন্ধান করতে পারছে না। আমি চাই তোমরা কৃতকার্য হবে। যাও, এক্ষুণি চলে যাও।

রহমান মাথা চুলকে বলে—চৌধুরী কন্যার জন্য...মানে....

আমার এতো মাথাব্যথা কেন, এইতো বলতে চাচ্ছো?

তিনি বুঝি কন্যার জন্য বড় রকমের পুরস্কার ঘোষণা করেছেন? কথাটা বলে রহমান।

না, তিনি করেন নি, আমি করলুম। যে চৌধুরী কন্যার সন্ধান সর্বপ্রথম এনে দিতে পারবে, সে আমার সবচেয়ে প্রিয় হবে এবং আমি তাকে লাখ টাকা পুরস্কার দেব।

রহমান বেরিয়ে যায়।

বনহুর ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারি করতে থাকে। গোটা রাত অনিদ্রায় চোখ দুটো লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। মাথার চুলগুলো এলোমেলো; ললাটে গভীর চিন্তারেখা ফুটে উঠেছে।

এমন সময় নূরী কক্ষে প্রবেশ করলো। রহমান তাকে কথাটা বলেছে। নূরীর মনেও ঝড় বইতে শুরু করেছে। চৌধুরী-কন্যার জন্য তার এত দরদ কেন! লাখ টাকা পুরস্কার দেবে বনহুর কেন, কেন এতো উন্মত্ত হয়ে উঠেছে সে। ধীর পদক্ষেপে বনহুরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল নূরী। বনহুরের চেহারা দেখে হঠাৎ কিছু বলতে সাহস হলো না তার। তবু একটু কেশে বলল নূরী—হুর, হঠাৎ তোমার কি হয়েছে, অমন করছো কেন?

বনহুরের কানে নূরীর কণ্ঠ পৌঁছলো কিনা কে জানে। বনহুর দ্রুত সেখান থেকে চলে গেল নিজের কক্ষে। ক্ষিপ্র-হস্তে শরীর থেকে পোশাক বদলাতে লাগল। বনহুরের চোখে-মুখে এক উন্মত্ত ভাব ফুটে উঠেছে। শিকারীর ড্রেসে সজ্জিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। পিঠের সঙ্গে রাইফেল বাঁধা। কোমরের বেল্টে গুলীভরা রিভলভার।

নূরী এসে সম্মুখে দাঁড়ালো—কোথায় যাচ্ছো হুর?

শিকারে।

হঠাৎ আজ এই অসময়ে শিকারের খেয়াল হল কেন?

অনেক দিন শিকারে যাইনি তাই।

কিন্তু না খেয়েই যাবে? গোটা রাত বাইরে কাটিয়ে এই তো সবে ফিরলে—চলো, কিছু মুখে দিয়ে যাও।

না, ক্ষুধা আমার পায় নি নূরী।

তা হবে না, তোমাকে কিছু না খেয়ে এই সকাল বেলা বেরুতেই দেব না।

নূরী!

নূরীর মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হয় বনহুরের, বলে সে—চলো।

বনহুর আর নূরী খাওয়ার কক্ষে এসে বসলো।

বাবুর্চি টেবিলে চা-নাস্তা সাজিয়ে রাখল। নূরী খাবার এগিয়ে দিল বনহুরের সম্মুখে। বনহুর অন্যমনস্কভাবে খাবার মুখে তুলে দিতে লাগল। একটু খেয়েই উঠে পড়ল সে।

নূরী ব্যথিত কণ্ঠে বলল—একি, কিছুই যে খেলে না হুর?

এই তো অনেক খেয়েছি—টেবিলে ঠেস দেওয়া রাইফেলটা হাতে উঠিয়ে নেয় বনহুর।

নূরী ব্যাকুল আঁখি মেলে তাকায় বনহুরের মুখের দিকে, শত শত প্রশ্ন তার মনকে অস্থির করে তুলছে, কিন্তু বনহুরকে কিছুই জিজ্ঞাসা করার মত অবকাশ হয় না তার।

বনহুর নূরীর স্থির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠে—আল্লাহ হাফেজ।

বনহুর বেরিয়ে যায়।

নূরী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

পরবর্তী বই

নাথুরামের কবলে মনিরা